চিমনি

সুবোধ বসু

গ্রন্থাগার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীভূপতি চৌধুরী

প্রচ্ছদ-চিত্র

শ্রীপ্রিয় গুহ

মুদ্রাকর

শ্রীবিভূতি ভূষণ সেন

উদয়ন প্রেস,

৬ কলেজ রো, কলিকাতা

ব্লক ও ব্লক মুদ্রণ

প্রসেস্ আর্টো অ্যাণ্ড প্রিণ্ট

প্রকাশক

'গ্রন্থাগারে'র পক্ষে

পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড,

কলিকাতা হইতে

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু

শ্রীসুধাংশু সেন

প্রীতিভাজনেষু

সুবোধ বসু-র
অন্যান্য বই

উপন্যাস

রাজধানী

পদ্মা-প্রমত্তা নদী

পদধ্বনি

মানবের শত্রু নারী

পাখির বাসা

সহচরী

নবমেঘদূত

স্বর্গ

নটী

স্ত্রী-যুদ্ধ

বন্দিনী

গল্প-সংগ্রহ

জয়যাত্রা

বিগত বসন্ত

নাটিকা

অতিথি

তৃতীয় পক্ষ

কলেবর

বুদ্ধির্যস্য

এক

গ্রামের নাম দশার্ণপুর। কলিকাতা হইতে মাত্র ছাপ্পান্ন মাইল দূর। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সাতচল্লিশ মাইলের মুখে মোড় লইয়া, সজনেহাটার সাঁকো পার হইয়া, প্রকাণ্ড খেজুর বনটা ছাড়াইলেই দশার্ণপুর আত্মপ্রকাশ করিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জায়গাটা পৃথিবীর যে-কোনও স্থান হইতেই বহু যোজন দূরে। অনায়াসেই মনে করা সম্ভব যে, এই গ্রামের উপর দিয়া, ইহারই কেতকী-বনে ছায়া-নিক্ষেপ করিয়া কালিদাসের মেঘদূত অলকার দিকে উড়িয়া গিয়াছিল। সামনে পশ্চাতে, ডাহিনে বামে, যে দিকেই তাকাও, সুদূরতম দিগন্ত-রেখার নিকটেও একটা কলের চিম্‌নি আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

গ্রামটা কৃষক-প্রধান। ইহারা সময়ের সাথে বদলায় না; সময়কে উপেক্ষা করিয়া চলিবার ক্ষমতা ইহাদের অত্যাশ্চর্য্য। সজনেহাটার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বিপজ্জনক রাস্তায় মোটর-বাস অবজ্ঞাভরে আসিতে অস্বীকার করিয়াছে। যানাভাবে সভ্যতা আসিয়াও পৌঁছাইতে পারে নাই।

গ্রামের একপ্রান্তে প্রকাণ্ড জমকালো জমিদার বাড়ি। গ্রামে জমিদারের আবির্ভাব একটা বিশেষ ঘটনার পর্য্যায়ে পড়ে; এই জমিদার বাড়িই জবরজঙ্গ প্রহরীর মতো মালিকের অস্তিত্বের কথা প্রজা-সাধারণকে স্মরণ করাইয়া রাখে। তবে শুধু জমিদারের বাড়িই নয়, জমিদারের কাছারি, নায়েব এবং পাইক-পেয়াদাও আছে; স্মরণ করাইবার দিকে তাহাদের উৎসাহও কম নয়। ইহা ছাড়া, গ্রামে দু'চার

ঘর মধ্যবিত্ত পরিবারও আছে; দু'চারটা কোঠাবাড়ি নাই এমনও নয়। কিন্তু সমগ্র-ভাবে নজর করিলে শন ও খড় দিয়া ছাওয়া কাঁচা ঘরগুলিকে ঝোপঝাড় ও দিগন্তপ্রসারিত ক্ষেতের মধ্যে অসংখ্য মৌচাকের সমষ্টি বলিয়া মনে হইবে।

চুপচাপ শান্ত গ্রামটি। গাছে এবং জঙ্গলে ভর্ত্তি। দুইপাশে চষা মাঠ। ইঁদারা হইতে গাঁয়ের মেয়েরা কলস ভরিয়া জল লইয়া যায়; অল্পবয়সী ছেলেপিলেরা পিলে-ভরা পেটের স্ফীতি উপেক্ষা করিয়া আকাশে ঘুড়ি উড়ায়। শনি মঙ্গলবারে সজনেহাটার হাটের দিকে মিছিল শুরু হয়। সব্‌জি, ফলমূল, হাঁস ও হাঁসের ডিম ধামা ধামা চালান হয়। ধান ও কলাই বোঝাই গরুর গাড়ি উৎকট শব্দ করিতে করিতে দিগন্তজোড়া নৈঃশব্দ্যকে বিদীর্ণ করে। জীবনধারা একটি অলস স্বপ্নের মতো গড়াইয়া চলে।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর পরে গ্রামের ছেলে সঞ্জীব যেদিন গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেদিন এ গ্রামটা কি বাঁচিয়া আছে, না ইতিমধ্যে মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাই যেন সে অবাক হইয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সব চুপচাপ; কোথাও জীবনের স্পন্দন নাই। ফসল কাটা শেষ হইয়াছে; নিরাভরণ মাঠগুলিতে কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই। রিক্ত মাঠের সমুদ্রে কুটিরের পুঞ্জ যেন নির্জ্জন দ্বীপের মতো নিঃশব্দ ও মৃত। গ্রামটা যেন রাক্ষসের হানা-দেওয়া রাজপুরীর মতো; সবই আছে, শুধু কোথাও জীবনের স্পন্দন নাই; রাক্ষসের অত্যাচারে প্রাণ-চাঞ্চল্য থামিয়া গেছে।

এই রাক্ষসকে জয় করিতেই সঞ্জীব আসিয়াছিল। কিন্তু নিজের দুঃসাহসিকতায় সে নিজেও সেদিন মনে মনে না কাঁপিয়া পারে নাই। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা এই রাক্ষসের শাণিত নখর। গ্রামের এতগুলি লোক এই নখের আঁচড়ের সামনে দাঁড়াইতে

পারে নাই, একা সে কি পারিবে? কিন্তু কর্তব্য যতই কঠিন হউক, আগাইয়া না গেলে চলিবে কেন? তাহার পক্ষে ইহা তো মাত্র আদর্শ-উদ্‌যাপন নয়, ইহা তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। কৃত-কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে মনের পলাতক শান্তি ফিরাইয়া আনিতে চায়, সুস্থ বোধ করিতে চায়। কিন্তু কর্তব্য একা বহন করিতে হইবে, তাহাই বা কে বলিল? গ্রামের নির্জ্জীব মানুষগুলিই উপযুক্ত অনুপ্রেরণা পাইলে আবার বাঁচিয়া উঠিবে। দেহের এবং মনের অজ্ঞাত কোণ হইতে উদ্দাম জীবনীশক্তি ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের বাহুতে বল জোগাইবে; অচল রথের দড়িতে হাজার হাতের টান পড়িবে।

এই আশা লইয়াই সেদিন সঞ্জীব কাজে নামিয়াছিল। সেদিন তাহার আত্মীয়-পরিচিত এমন কেহ ছিল না যে, তাহার অবিমৃষ্য-কারিতা দেখিয়া ধিক্কার দেয় নাই। গ্রামের উন্নতি বৈ কি। ডেপুটিগিরির কাজে ইস্তফা দিয়া চাষা সাজিয়া বসা! পাগ্‌লামিরও মাত্রা থাকা উচিত। কত জন তাহাকে অকৃত্রিম হিতৈষণা সহকারে উপদেশ দিল: 'বেশ তো, ডেপুটিগিরি চাকরি পছন্দ না হয়, যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্টরি তো করিতে পার। চট্‌পট্‌ ধনী হইয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু এ কোন্‌ দেশী শখ!'

সঞ্জীব একগুঁয়ে লোক। কোনও দিনই সে অন্যের পরামর্শ শোনে না, এবারও শুনিল না। কো-অপারেটিভ্‌ প্রথায় গ্রামের দুঃখ দূর করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষায় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অবতীর্ণ হইল। সমবায়ের ভিত্তিতে একত্র মিলিয়া কি করিয়া সুদখোরের হাত এড়ানো যায়, কি করিয়া ফড়িয়ার হাত এড়াইয়া ভালো দামে মাঠের ফসল ও হাতের তৈরি জিনিষ বেচা যায়, কি করিয়া সমবেতভাবে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি কেনা চলে, কি করিয়া ধর্ম্মগোলায় ফসল জমা করিয়া চড়তির বাজারের জন্য অপেক্ষা করা যায়, এসকল তথ্য সে ইহাদের শিখাইতে আরম্ভ করিল।

সজনেহাটার মহাজনেরা চাষীদের ভয় দেখাইয়াছে, নানা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু সমবায় আটকাইতে পারে নাই। এই আন্দোলনের পিছনে যিনি আছেন তিনি স্বয়ং হাকিম ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের সাথে পরিচয় থাকায় কৃষক-রক্ষার বিধানগুলি ইনি সহজেই সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া বাধাদান কখনও খুব স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হইয়া ওঠে নাই। ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া ঋণ-সালিশী বোর্ডের প্রবর্ত্তন করিবার ইহারা পক্ষপাতী নহে। দশার্ণপুরের গ্রাম-উন্নয়ন সঙ্ঘের কার্য্যাবলী সত্ত্বেও তাহারা যখন বংশানুক্রমিক কারবার চালাইতে পারিতেছে, চড়া সুদ আদায় ও শস্তায় ফসল মজুত করিতে পারিতেছে, তখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

গত দেড় বছরে কাজ কম হয় নাই। দশার্ণপুরের খাটিয়েরা যেমন আগ্রহ সহকারে সমবায়ের সুবিধা গ্রহণ করিতেছে, যেমন অধিক সংখ্যায় সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছে, তাহাতে আশান্বিত না হইয়া উপায় নাই। সঞ্জীব একটা ডাক দিলে পাঁচশো লোক আসিয়া কাছে দাঁড়াইবে, পরম বিশ্বাসে তার উপদেশ শুনিবে, তার এক কথায় পুরাতন মামলা মিটাইয়া ফেলিবে, বহুকালের সংস্কার বিসর্জ্জন দিতেও দ্বিধা করিবে না। সেবার দ্বারা যতই সে ইহাদের আস্থা অর্জ্জন করিতে লাগিল, ততই ইহাদের সুখী ও সুস্থ করিবার দায়িত্ব যেন আরও বেশি করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইল। ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের একটি গ্রামকে শ্রীসম্পন্ন ও সুখী করিতে পারাই তাহার জীবনে একমাত্র আদর্শ হইয়া উঠিল।

পৌষ মাসের ভোরবেলা। বেলা প্রায় আটটা সাড়ে আটটা, কিন্তু গ্রামের মুখের উপর হইতে কুয়াশার ঘোমটা এখনও সরে নাই। কিন্তু এরই মধ্যেই দশার্ণপুর অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কলরব এবং ক্লাস শুরু হইয়া গেছে।

অবৈতনিক হইলেও দশার্ণপুর বিদ্যালয়ের চেহারাটা রীতিমত সম্ভ্রান্ত।

ইহার সহজ কারণ এই যে, স্কুল-বাড়িটা গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের টাকায় তৈরি হয় নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের অবিমৃষ্য-কারিতার কথা কল্পনা না করিয়া বংশধরবর্গের ভোগের জন্যই বাস্তুভিটা পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। হিসাবী পূর্ব্বপুরুষদের বেহিসাবী উত্তরাধিকারী সঞ্জীব তাহাদের এই বংশধর-প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বাড়িটাকে গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের নামে লিখিয়া দিয়াছে। প্রথমে নিজের ব্যবহারের জন্য দুটি কোঠা ছিল। গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের চৌহদ্দির এক প্রান্তে থাকিবার মতো একটা মাটির ঘর তৈয়ারি হইবার পর সে কোঠা-দুটিও ছাড়িয়া দিয়াছে।

সপ্তাহে দু'তিন দিন সঞ্জীব নিজেও ক্লাস নেয়। এক সময় ছিল যখন প্রত্যেকটা ক্লাস তাকে একাই লইতে হইত। তার পর গ্রামের কয়েক জন শিক্ষিত লোক তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলে ছেলে-পড়ানোর কাজ হইতে সঞ্জীব অনেকটা রেহাই পাইয়াছে। ইচ্ছা করিলে এখন তার না পড়াইলেও চলে, কিন্তু গ্রামের ভবিষ্যৎ কালের মানুষদের সঙ্গে সে সংস্পর্শ হারাইতে চাহে না, সময় করিয়া সপ্তাহে কয় ঘণ্টা করিয়া পড়াইয়া যায়।

সারা ঘব জুড়িয়া শতরঞ্জি পাতা। ইহার এক প্রান্তে শাদা তুলার আসনের উপর উদ্‌গ্রীব ছাত্রছাত্রীদের দিকে মুখ করিয়া দা-ঠাকুরের ভঙ্গিতে সঞ্জীব বসিযাছে। বস্তুতঃ সে ইহাদেব 'দা-ঠাকুর'ই বটে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সে দা-ঠাকুর নামেই পরিচিত।

সঞ্জীবেব বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মতন। মুখটা লম্বাটে, নাক তীক্ষ্ণ, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর। চুলগুলি এলোমেলো এবং কিছুটা লম্বা। আঙুলগুলি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ, কিন্তু লোহার শলার মতো শক্ত। শরীরের বাঁধুনিতে বলিষ্ঠতার আভাস আছে, মেদের আভাস নাই। প্রকৃতিটা কিঞ্চিৎ গম্ভীর-ঘেঁষা হইলেও রুক্ষ নয়। বাদামি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবিতে তাহাকে

অনেকটা কবি-কবি দেখাইতেছে ; চাদর গায়ে থাকিলে কথক-ঠাকুর বলিয়া মনে হইতে পারিত।

এতক্ষণ ধরিয়া সে এক ক্লাস ছেলেমেয়ের কাছে ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইলে শরীর এবং মন কি করিয়া গঠন করিতে হইবে, তাহা বালকবোধ্য সহজ ভাষায় উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দিয়াছে। এইবার প্রশ্নোত্তরের পালা। ছেলে-মেয়েরা দা-ঠাকুরের ক্লাসের এই অংশটা খুবই উপভোগ করে। এই সময়ের জন্য সকলেই বহু প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া রাখে।

তাঁতী পতিতপাবনের পুত্র নিমাই প্রথম সুযোগেই উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'এজ্ঞে, দা-ঠাকুর, অ্যাংরেজ দেশ থে চলে গেলে দেশের রাজা হবে কে?' বেচারীর মুখে সুগভীর উদ্বেগ দেখিয়া সমস্যাটা তাহাকে কতখানি ব্যাকুল করিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

সঞ্জীব সহৃদয় ভাবেই জবাব দিল ; কহিল, 'কোনও রাজার দরকার নেই। রাজা ছাড়াই আজকাল রাজ্য চলে। আমাদের কারা শাসন করবে, আমরাই তা ঠিক করে দিই। আমাদের মত জানিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে ভোট দেওয়া। সবাই তো রাজ্য চালাতে পারে না। তাই আমরা ভালো দেখে লোক বেছে তাদের আমাদের সকলের হয়ে রাজ্য চালাতে বলি। একে বলা হয় গণতন্ত্র।'

জবাব শুনিয়া নিমাই আরও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, 'মন্ত্রী, সেনাপতি, এসব থাকবে তো, না তারও দরকার নেই?'

'সেসব থাকবে। আর রাজার বদলে থাকবে প্রেসিডেণ্ট।'

'বাঁচা গেল।' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিমাই আসন গ্রহণ করিল।

মধু নাপিতের তোত্‌লা ছেলেটা কিন্তু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। সে জিহ্বার বাধা অস্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিল, 'অ্যা অ্যা

অ্যাংরেজের সসঙ্গে বিবিলিতি কুকুমড়ো, বিবিলিতি বেবেগুনও চলে যাবে নি, দাঠাকুর ?'

'আমাদের দেশে যা জন্মায়, তা আমাদের দেশেই থাকবে।' করুণ দৃষ্টিতে তোত্‌লা ছেলেটার বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া সঞ্জীব সদয়কণ্ঠেই উহার হাস্যকর প্রশ্নের জবাব দিল। ভাবিতে লাগিল, ভালো করিয়া চিকিৎসা করাইলে কি উহার তোত্‌লামিটা দূর করা যায় না ?

কালু শেখের ছোট ছেলে হাসু এতক্ষণ ধরিয়া প্রশ্ন বাগাইতেছিল, সঞ্জীবকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের জিজ্ঞাসু সদস্যের মর্য্যাদার সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'আল্লা বড়ো না ঈশ্বর বড়ো, কয়ে দাও দিনি, দা-ঠাকুর ? কেষ্টা কয়, ঈশ্বর বড়ো। আমি বলনু, উহুঁ, বড়ো হলো গিয়ে মোছলমানের আল্লা। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নেমাজ পড়ি, তোরা ক'বার পড়িস ?'

সঞ্জীবের মুখটা কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গম্ভীরভাবেই সে কহিল, 'হাসু বড়ো না কালু শেখের ছোট ছেলেটা বড়ো, আগে তাই বল দেখি ?'

'ইহি, কি বলচ !' হাসু সলজ্জ মুখে কুণ্ঠিতভাবে কহিল, 'আমরা দুজনাই তা হলাম এক...'

'আল্লা আর ঈশ্বরও তাই। তাঁরা দুজনেই এক, শুধু ভিন্ন নামে তাদের ডাকা হয়—কিন্তু আজ এখন তোদের ছুটি। আমার কাজ আছে। পরের দিন অন্যদের প্রশ্নের...'

'হেই দা-ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, আর একটি কথা বলে যাও।' বলিয়া অপর একটি অধৈর্য্য প্রশ্নকর্ত্তা দাঁড়াইয়া উঠিল। 'জমিদারবাবুরা যে মস্ত হাওয়া-গাড়িটায় চেপে গাঁয়ে অ্যায়েচেন, তার দামটা কত হবে ? আমি বলি দশ কুড়ির বেশি লয়। পুঁটি বলে, হ্যাঁ, তা বৈকি, তার ঢের বেশি। তিরিশ কুড়ির বেশি হবে তো কম লয়। হ্যাঁ দা-ঠাকুর,

দশ কুড়ির বেশি হবে কি? পরশু তারা গাঁয়ে এলেন, আর অমনি তুমি তাদের বাড়ি গট্‌গট্‌ করে সোজা গিয়ে ঢুকলে, আমরা সব দেখেছি। তুমি কি আর গাড়ির দামটা জেনে নাও নি?'

গ্রামের জমিদার মহিমকুমার সঞ্জীবের আশৈশব বন্ধু। তাহার আহ্বানেই এবার ইহারা গ্রামে আসিয়াছে। কিন্তু অবিলম্বে ইহাদের 'হাওয়া-গাড়ির' দামটা জানিয়া লওয়া যে এতটা অত্যাবশ্যক মাত্র এতক্ষণে সে তাহা টের পাইল।

মহিমদের কলিকাতার বাড়িটা ছাত্রজীবনে সঞ্জীবের প্রধান আড্ডার জায়গা ছিল। সেখানে সে বাড়ির ছেলের মতো হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় যখন মহিমের টিফিন যাইত, তখন তাহাতে সঞ্জীবের ভাগও থাকিত। একই কলেজ হইতে দুজন একই বছরে বি-এ পাস করিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সঞ্জীব ডেপুটিগিরি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিল; মহিম সে চেষ্টা করিল না, ইকনমিক্‌স্‌-এ এম-এ পড়িল। মহিমের বাবা প্রসন্নকুমার তখন বাঁচিয়া আছেন; সঞ্জীবের সাফল্যের খবর পাইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবকে ঘটা করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন।

বছর ছয়েকের চাকরি-জীবনে নানা ঘাটের জল খাইয়া সঞ্জীব যখন হাওড়ায় বদ্‌লি হইয়া আসিল, তখন প্রসন্নকুমার পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। শোকের আঘাতে বিভ্রান্ত মহিমের মা সংসার দেখাশোনার ভার মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন; সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে মহিমের বোন প্রতিমা।

ছ'বছরের আগের কিশোরী প্রতিমা এখন রীতিমত ভদ্রমহিলা। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে সে বি-এ পড়ে। ইতিমধ্যে এতগুলি সমিতির সে সম্পাদিকা হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের কল্যাণেই নিজের মাসোহারার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়। বাবা যে তাহার নামে

সম্পত্তির তৃতীয়াংশ লিখিয়া গিয়াছেন, এই জ্ঞানটা তাহাকে হিসাব করিয়া টাকা ব্যয় করিতে সহায়তা করে নাই।

এই বাড়িতে চা এবং রাজনীতি-চর্চ্চার মধ্যপথেই হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হইতে সঞ্জীবের কাছে সেই গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন আহ্বানটি আসিয়াছিল। হাওড়ার অনেকগুলি কারখানায় তখন বড় রকমের ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। উত্তেজনা প্রবল; মালিকে ও শ্রমিকে কৌশল ও বলের লড়াই চলিতেছে। শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটার উপর কড়া নজর রাখিয়াছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হইতে আদেশ আসিল—'এক্ষুনি রিভার জুট মিলে যাও। সেখানে কুলিরা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের কোনও গুণ্ডামি সহ্য করা হইবে না। শান্তিভঙ্গের উপক্রম হওয়া মাত্র গুলি ছুঁড়িবার আদেশ দিবে।' উপরওয়ালার এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এবং প্রতিমার বিরক্তির সম্মান না করিয়া সঞ্জীব অকুস্থানে হাজির হইয়াছিল।

ধর্ম্মঘটী মজুর অত আইন-কানুন বোঝে না। মালিকের সাথে লড়িয়া তাহাদের জিতিতে হইবে, নহিলে ভাগ্যে উপবাস। অশিক্ষিত লোক একবার ক্ষেপিলে উদ্দাম হইয়া ওঠে, ইহারাও হইল। সরিয়া যাইবার জন্য পুলিশের হুকুম উহারা অগ্রাহ্য করিল তো বটেই, উপরন্তু কারখানার ফটকের উপর আক্রমণ চালাইয়া ছাড়িল। দু'পাঁচটা ঢিল তো পুলিশের উপরই আসিয়া পড়িল; সঞ্জীবের হাঁটুতে একটা ঢিল জোরে আসিয়া লাগিল। পুলিশের সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টর অধৈর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল: 'ফায়ারিং-এর অর্ডার দিন, স্যার; আর দেরি করবেন না। আমরা কি পড়ে পড়ে মার খাব?'

আদেশ মিলিল। পুলিশের গুলি ছুটিল, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! পাঁচ পাঁচটা লোক কাৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। স্তম্ভিত, বিভ্রান্ত সঞ্জীবের অস্পষ্ট দৃষ্টিপথ দিয়া কতগুলি আর্ত্তনাদপরায়ণ স্ত্রীলোক ও

একপাল ক্রন্দমান শিশু ছুটিয়া গিয়া মৃত দেহগুলির উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। গগনভেদী চিৎকারে সঞ্জীবের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই তো ইতিহাস।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ত্তা হিসাবে সঞ্জীব নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নৃশংসতা করে নাই। কিন্তু পাঁচটা মৃতদেহ এবং তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যে জগৎজোড়া আর্ত্তনাদ উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা তাহার সূক্ষ্মতম স্নায়ুতন্ত্রীগুলিতে কায়েম হইয়া বসিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, চটকলের কতগুলি বিদেশী পুঁজিবাদীর স্বার্থরক্ষার জন্য সে অতি নিষ্ঠুরভাবে একদল বুভুক্ষু দেশবাসীকে হত্যা করাইয়াছে। সবলের পক্ষ হইয়া দুর্ব্বলকে বিনাশ করিয়াছে। এই চিন্তার ফলে ক্রমে তার মানসিক অবস্থা এমন হইল যে, রাতে সে ঘুমাইতে পারে না, একটা অপরাধের ভারে যেন সারাক্ষণ ন্যুব্জ হইয়া থাকে। খাইতে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হয় না। বহু বড় বড় ডাক্তার দেখাইল, অনেক ব্রোমাইড খাইল, কিন্তু কোনও উপকার হইল না। শঙ্কিত হইয়া সে ভাবিতে লাগিল: 'আমি কি পাগল হয়ে যাব?' ইহার মাস পাঁচেক পরে মহিমদের বাড়ির আরেক চায়ের মজলিসে সঞ্জীব পদত্যাগের খবর দিয়া উহাদের সারা পরিবারকে আবার চমকাইয়া দিয়াছিল।

সপ্তাহ দুই আগে সঞ্জীব একবার কলিকাতা গিয়াছিল; প্রায়ই তাকে গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের কাজে কলিকাতা যাইতে হয়। তখনই সে মহিমকে গ্রামে আসার পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিল।

মহিম তখন দেশের ইণ্ডাস্ট্রি বাড়াইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবার নানা প্ল্যান ফাঁদিতেছে। প্রতিমা কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যায় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। সঞ্জীব অতি সহজে উভয়ের সমস্যারই সমাধান করিয়া দিল। মহিম গ্রামে আসিয়া দেখুক সমবায়ের ফল, বিচার করুক

জমিদারের সহায়তায় এই পথে আরও কতদূর আগানো যায়। আর প্রতিমা অন্ততঃ মামুলি চেঞ্জের একঘেয়েমির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গ্রামে আসুক।

প্রধান আপত্তি উঠিয়াছিল মহিমের মা ব্রজময়ীর কাছ হইতে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর দেশের বাড়িতে যান নাই। অতীতের স্মৃতিগুলি যেন কাঁটা হইয়া পথ আগলাইয়া আছে। কিন্তু সঞ্জীব তাহার কানে কি মন্ত্র দিল সে-ই জানে, তিনি শুধু রাজি নয় অকস্মাৎ দেশে যাইবার জেদ ধরিলেন। বলিলেন, 'শত হোক, মহিম, ওটাই তোদের নিজের জায়গা। বাপ-পিতামোর গৌরবে ভরা। ঐখেনের পরিচয়েই তোদের পরিচয়।'

প্রতিমা সঞ্জীবকে বলিয়াছিল, 'পটাবার কাজে যে রকম দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন, তাতে মধ্যযুগ হলে ব্ল্যাক-আর্টের দায়ে পড়তে হতো।'

সঞ্জীব সহাস্যে বলিয়াছিল, 'ভাগ্যে এটা মধ্যযুগ নয়।'

'কিন্তু গাঁয়ে?'

'আগে চলই তো।'

দুই

জমিদার বাড়ির চৌহদ্দি প্রায় বিশ-পঁচিশ বিঘা জুড়িয়া। প্রকাণ্ড সিং-দরজা হইতে লাল কাঁকরের পথ বাগানের আধাআধি গিয়া একটা পদ্মবনের কাছে পৌছিয়াই দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। পদ্মবনের কাছে শাদা পাথরের বেদী। এই বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া পথ আবার জোড়া লাগিয়াছে। পথের দুপাশেই সযত্ন বর্দ্ধিত ফুলের বেড; বেডের পর উভয় পাশেই ছাঁটা সবুজ লন্। তাহারও ওদিকে শাসনের শিথিলতা আবিষ্কার করিয়াই যেন নানা ধরণের ঝোপঝাড় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এগুলির পিছনে এক ধারে বড়ো পুষ্করিণী ও অন্যদিকে পাঁচিলেব সমান্তরাল একটা কৃত্রিম খাল চুপচাপ পড়িয়া আছে।

জমিদার বাড়ির বড়ো দালানটাকে প্রথমে দৃষ্টিতে নীলকুঠি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু কাছে আগাইয়া আসিলে বরঞ্চ মুঘল স্থাপত্যরীতিব স্মৃতিসৌধের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। খুব উঁচু ভিতের উপব একতলা ইমারত। সামনে হইতে অসংখ্য চওডা সিঁডি উঠিয়া গিয়াছে। মুঘল স্মৃতিসৌধের সিঁডি যেমন সবাসরি না উঠিয়া দুপাশ ধবিযা ওঠে তেমন নয; কিন্তু উপরে উঠিয়া আসিলে ঠিক তেমনই খোলা চত্বরে পৌছায়। এই চত্বর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিযা আছে।

প্রকাণ্ড থামওয়ালা ঢাকা-বারান্দা পার হইয়া কোঠা আরম্ভ হইয়াছে। দুই সারি কোঠার মধ্য দিয়া চওড়া বারান্দা পিছনের চত্বরে গিয়া হাজিব হইয়াছে।

উঁচু ভিতের সুযোগ লইয়া নিচে বহু কুঠরি তৈয়ারি হইয়াছে। এগুলি পাইক-পেয়াদা, ঝি-চাকর, গাডি-ঘোড়া প্রভৃতির আস্তানা। পুষ্করিণীর

পায়ে অফিস-দালান, বালাখানা প্রভৃতি। এই পুকুরেরই এক পাশে ঠাকুর-বাড়ি।

গত পাঁচ-ছয় বৎসর এইপ্রকাণ্ড বাড়িটা যেন নির্জ্জীব হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ইহার একদিন ছিল যখন জমিদারবাবুরা বহু অতিথি-বান্ধব লইয়া দশার্ণপুর প্রাসাদে উপস্থিত হইতেন; কলকোলাহলে, খানা-পিনায়, গান-বাজনায় সারা বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিত। মাছ-ধরা ও পাখি-শিকারের তোড়জোড় চলিত। বাইজি আসিত, যাত্রা আসিত। কিন্তু প্রতি নতুন উত্তরাধিকারীর সঙ্গে সঙ্গেই আড়ম্বর কমিয়া অরসিক নতুন কালের রীতি প্রকটিত হইয়াছে।

প্রসন্নকুমার ছিলেন সাহেবী রুচির লোক। প্রতি বছরই তিনি একবার করিয়া গ্রামে আসিতেন, কিন্তু মোটরে, বাবুর্চ্চিতে, বিলিতি পোশাকে ও বিলিতি চাল-চলনে মর্য্যাদা থাকিলেও পুরাতন আড়ম্বর অব্যাহত ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই বাৎসরিক আগমনও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে মহিমকুমারের প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি একদিন দশার্ণপুরের জমিদার বাড়ির বৃহৎ সিং-দরজা দিয়া লাল কাঁকরের পথে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত রাজপুরী চকিতে জাগিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ সময় লইয়া প্রতিমা স্নান করিয়াছে। অনাবশ্যক বেশিক্ষণ ধরিয়া নিজের শুইবার ঘরের আয়নার টেবিলের সামনে বসিয়া সরু এবং মোটা নানা ধরণের চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে, মুখে অনাবশ্যক অঙ্গরাগ বেশিক্ষণ ঘষিয়াছে। কিন্তু বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের কাহারও কাজ মিটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

প্রতিমা বছর তেইশ-চব্বিশের সতেজ সপ্রতিভ মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রং, পরিপূর্ণ মুখ, চোখের চাউনি বুদ্ধি-প্রদীপ্ত, ওষ্ঠরেখা ও নাসিকা যেনঅতি স্পষ্ট করিয়া কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে। দেহের গড়ন মোটা নয়,

কিন্তু স্বাস্থ্যপূর্ণ। প্রতিমা হাল্কা ধরণের মেয়ে নয়; মুখের ভাবে এবং চাল-চলনের ভঙ্গিতে এমন একটা মর্য্যাদা আছে যে, তাহাকে একটু বেশি গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু তাহার কথা শুনিলে এ আশঙ্কা দূর হয়।

খাটের উপর অনাবৃত সেতারটায় সে দু'একবার পিড়িং পিড়িং করিল, কিন্তু বাজাইবার উৎসাহ সংগ্রহ করিতে পারিল না। অধৈর্য্যভাবে সরিয়া গিয়া সে দক্ষিণমুখী জানালাটার কাছে দাঁড়াইল। বাগানের প্রান্তে অপরিসর খালটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া একটা রূপার ফিতার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাকে যতই সে দেখে, ইহার নির্ম্মাতা পূর্ব্বপুরুষটির রুচির প্রশংসা না করিয়া পারে না। প্রতিভার এক আঁচড়ে কি করিয়া বনস্থলীর সৌন্দর্য্য বিকশিত করা যায়, ইহা যেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই খাল পার হইয়া, সীমানার উঁচু প্রাচীর পার হইয়া, ধেনো জমি পার হইয়া প্রতিমার দৃষ্টি আরও দূরের দিকে চলিল। প্রথমেই নজর পড়ে, সঞ্জীবদের বাড়ির দালান। ইহার সামান্য দূরে অনেকগুলি শণের ও টিনের ছাউনি-অলা কুটির পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। প্রতিমা এখনও ওদিকে যায় নাই, কিন্তু ওগুলিই যে সঞ্জীবের গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের বাড়ি, তা সে জানে। দূর হইতে এগুলিকে ভারি অশক্ত ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মহিম দেখিয়া আসিয়া এখানের কাজের প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বড় রকম পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া সে বিশ্বাস করে নাই। সঞ্জীব ঈষৎ আহত হইয়াছে, এবং তর্ক করিয়া গত তিন দিন ধরিয়া মহিমকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই তর্কে বেচারি প্রতিমা একেবারে চাপা পড়িবার উপক্রম।

অধৈর্য্য হইয়া প্রতিমা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বৈঠকখানা ঘরে দুই বন্ধুতে যুক্তির লড়াই চলিতেছে। প্রতিমা সে দিকে পা বাড়াইল না। মায়ের পূজার ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। ঘণ্টা-

ঘুন্টেক আগে স্নানে যাইবার পূর্ব্বেই প্রতিমা মাকে পূজায় বসিতে দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঘণ্টায়ও আজকাল পূজার শেষ হয় না। আলাপযোগ্য বাড়ির এবং বাড়ির বাহিরের সকলেই যেন তাহার বিরুদ্ধে মৌনতার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এমন রাগই তার হইতেছে সঞ্জীববাবুর উপর। কতই তখন ফুস্‌লানো হইয়াছিল। গ্রাম নাকি খুবই ইণ্টারেস্টিং। দেখিবার মতো অনেক কিছু নাকি তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন কতই তার দেখা পাওয়া যাইতেছে! এ বাড়িতে আসিলে তর্ক ছাড়া আর কোনও দিকেই যদি তার নজর থাকে।

পা টিপিয়া টিপিয়া পূজার ঘরের কাছে আগাইয়া আসিয়া দরজা দিয়া প্রতিমা মাত্র তার নাকটা ভিতরে ঢুকাইল। ব্রজময়ী চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন; তামার পাত্রে পূজার ফুল এখন পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকও খরচ হয় নাই। বৃদ্ধা মায়ের এই ধ্যানমূর্ত্তি প্রতিমার বড়ো ভালো লাগে, কিন্তু পাত্রে এখনও এতগুলি ফুল অবশিষ্ট দেখিয়া সে মোটেই সন্তুষ্ট হইল না।

বারান্দার নানাস্থানে বিভিন্ন পরিচারিকা ব্রজময়ীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কেহ নারিকেল কুরিতে, কেহ পিঠের চাল বাটিতে, কেহ সুপারি কাটিতে, কেহ বা পলতে তৈরি করিতে ব্যস্ত ছিল। 'অগত্যা ওদিকেই,' বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া প্রতিমা অতিক্রান্ত পথেই ফিরিয়া চলিল।

মহিমের বাবাই বিলিতি কায়দায় ড্রয়িং-রুম সাজাইয়া গিয়াছিলেন। সারা মেঝেতে পুরু গালিচা বসিবার জন্য নহে, পাড়াইবার জন্য। দেওয়ালগুলি ফিকা নীল রঙে ডিস্‌টেম্পার করা; তাহাতে বিলিতি চিত্রকর ও বিলিতি চিত্রকরদের ভারতীয় শিষ্যদের আঁকা কিছু অয়েল ও কলার পেণ্টিং। মাথার উপর ফিকা হলুদ ও ঘষা কাঁচের অনেকগুলি ঝাড়-লণ্ঠন। ঘরের তিনদিকে 'ওল্ড ইংলিশ' ছাঁদের বহু সোফা-কৌচ ছড়ানো।

অপর দিকে মখমলের চাদরে ঢাকা একটা 'ডিভান্'। যেন জমিদার বাড়ির ফরাসের দাবিটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার একটি বিলিতি সংস্করণ তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। 'ডিভানের' কাছাকাছি সম্রান্ত চেহারার এক বিরাটকায় পিয়ানো স্ফীত উদরে দুনিয়ার সমস্ত সঙ্গীত মজুত করিয়া উদ্গার করিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

'ডিভানে'র উপর বৃদ্ধ প্রপিতামহদের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মখমল ও সিল্কের 'কুশান'গুলি নানাভাবে পিষ্ট করিতে করিতে মহিম বন্ধুর যুক্তির জবাব দিতেছে। সঞ্জীবের মুখের ভাবটা দেখিয়া তার প্রায় মায়া হইতেছে। এই তর্কের ফলাফলের উপরই যেন তার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। বেচারির দৃঢ় ধারণা, কল শয়তান, কারখানা দানবীয়। এই পথে দেশের মঙ্গল করা যাইবে না। একমাত্র কুটির-শিল্পই আমাদের শান্ত গ্রামের জীবনধারার পক্ষে উপযোগী ; ইহাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। সমবায়ের সহায়তায় এই কুটির-শিল্পকে বাঁচাইতে পারা সম্ভব। ইহা ছাড়া নাকি গ্রামগুলিকে বাঁচাইবার আর অন্য পথ নাই।

কনুই দিয়া আরও একটা পেলব বালিশকে ঘায়েল করিয়া মহিম কহিল, 'তা যেন হলো, কিন্তু চরকায় সুতো কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে, ঝুড়ি আর হাঁড়ি-কুড়ি তৈরি করে দেশের দারিদ্র্য কতখানি দূর করবি? দেশজোড়া দারিদ্র্য দূর করতে হলে জাতীয় উৎপাদন বাড়ানো চাই। নতুন ইণ্ডাস্ট্রি গড়তে হবে, নতুন কল বসাতে হবে। এর জন্য যদি কারখানার চিম্‌নিতে গ্রামের আকাশ ভরে যায়, তাতেও ক্ষতি নেই। লার্জ-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি গড়তে না পারলে...'

সঞ্জীব মাত্র ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় ভিতরের কড়াইডরের দিকের একটা দরজার এক পাটি সশব্দে বন্ধ হইল। উভয়ে তাকাইয়া দেখিল, কাছেই মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদের মত প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টি রীতিমত ক্রুদ্ধ।

'আয়, আয়, ভেতরে আয়।' মহিম ডাকিয়া কহিল।

'ইনি তর্ক বন্ধ করেছেন কি ?' সঞ্জীবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া প্রতিমা কৃত্রিম অভিযোগের সঙ্গে কহিল।

'মোটেই না।' মহিম সকৌতুকে কহিল। 'গান্ধী ও টলস্টয়ের যুক্তি-গুলি কেবল শুরু করেচে।'

'তবে নমস্কার।' বলিয়া সাড়ম্বরে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রতিমা সামনের দিকে আগাইয়া গেল।

তিন

তর্কের শেষ নাই। এ-তর্কের শেষও নজরে পড়িল না। এমন সময় বৈঠকখানার বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বেলা বারোটা বাজিবার খবর দিল। মহিমের বহু অকাট্য যুক্তি যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা তাহাতে সমর্থ হইল। সঞ্জীব রণে ভঙ্গ দিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে কহিল, 'আমি উঠলাম, মহিম। এতটা বেলা হয়েচে, বুঝতে পারিনি।'

'সে কি!' মহিম সপ্রতিবাদে কহিল। 'এত বেলায় কেউ না খেয়ে যায়! এ-বেলা আর যাস্‌নে। একটা বেলা কামাই দিলে তোর 'আশ্রম' নিশ্চয়ই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবেনা।'

'কাল যে নতুন তাঁতটা এসেছে, আজ তার পরীক্ষা।' সঞ্জীব মত-পরিবর্ত্তন না করিয়া কহিল। 'কলকাতা থেকে কোম্পানীর যে মিস্ত্রী এসেচে তার কাছ থেকে পতিতপাবনকে এর ব্যবহারটা শিখিয়ে নিতে হবে। নিজেও একটু দেখে রাখলে ভালো হয়। এমনিতেই বড় দেরি হয়ে গেছে।'

'তবে যা,' বলিয়া মহিম তার সুখাসন ছাড়িয়া উঠিল এবং চটি জুতা ফট্‌ফটাইয়া বন্ধুকে সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল। কহিল, 'পারিস তো সন্ধ্যেবেলা আসিস।'

লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া সঞ্জীব দ্রুত পায়ে সিং-দরজার দিকে আগাইয়া গেল। শীতের অতপ্ত রৌদ্র গায়ে সোনা মাখাইয়া দিল; মাথার চুল চক্‌চক্ করিতে লাগিল। বারোটায় নতুন তাঁতে কাজ আরম্ভ হইবার কথা। সে সময়ে সে উপস্থিত থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। অথচ জোরে হাঁটিয়া গেলেও সাড়ে বারোটার আগে পৌছান যাইবে

না। শান-বাঁধানো বেদী ও পদ্মবন বাঁয়ে ফেলিয়া সঞ্জীব অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে লাগিল।

কতক্ষণ ধরিয়াই পাখির ডানা-ঝাপ্‌টার মতো একটা পৌনঃপুনিক শব্দ কানে আসিতেছিল, এইবার সে ইহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বাঁ হাতের পাতা চোখের উপর ছাতার মতো মেলিয়া রৌদ্রপ্রদীপ্ত আকাশে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিল। কিছুই নজরে পড়িল না। বিস্মিতভাবে সঞ্জীব চারিদিকে তাকাইল। শব্দটা এতই সুস্পষ্ট যে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব, অথচ কোথায় যে উহার উদ্ভব, তাহাও কম রহস্যজনক নয়। এইবার সুদূর খালের কাছের ঝোপজঙ্গলের গায়ে একটি নারীমূর্ত্তি আবিষ্কার করা গেল। চকিতে সঞ্জীবের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুঝিল, শব্দটা ডানা-ঝাপটার নয়, হাততালির।

'প্রতিমা!' শোনা যায় এই রকম দূরত্বের মধ্যে পৌছিয়া সঞ্জীব চেঁচাইয়া কহিল। 'এখানে একা একা কি করচ?'

সঞ্জীব কাছে না-পৌছান পর্য্যন্ত প্রতিমা ইহার কোনও জবাব দিবার চেষ্টা করিল না। সঞ্জীব নিকটে আসিয়া নিজের প্রশ্নের পুনরুক্তি করিবার পর সে মুখের ভঙ্গি দার্শনিকের মতো করিয়া কহিল, 'নির্জ্জনতার মাধুর্য্য উপভোগ করছি। আপনাদের তর্কের শেষ হলো?'

'তর্কের শেষ নেই, তা জানো না?' সঞ্জীব হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল।

'সেটা আরও ভয়ঙ্কর কথা!' প্রতিমা গম্ভীর ভাবেই কহিল। 'নির্জ্জনতা উপভোগ আরও বহুদিন কপালে আছে, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা লোক আপনি! এক তরুণ জমিদারের নতুন-গজানো পরোপকার-প্রবৃত্তিতে উস্কানি দিয়ে তাকে পাড়া-গাঁয়ে নিয়ে এলেন। সেও ভাবলে, মন্দ কি। জমিদারির দিন ঘনিয়ে এসেছে; পরোপকারের সঙ্গে যদি নিজের ভবিষ্যতেরও একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারি, তবে তো

ভালোই! তার বুড়ি মায়ের সেণ্টিমেণ্টে আবেদন করে রাতারাতি তাকেও পটিয়ে ফেললেন। গাঁয়ে পৌছে অজস্র তাজা ফুল দিয়ে তিনি অসহ্য রকম বেশিক্ষণ পুজো-আহ্নিক করচেন; তুজনেই বেশ খুসিতে আছেন মনে হচ্চে। কিন্তু পরিবারে আরও একজন আছে। দিনের এতগুলি ঘণ্টা নিয়ে সে কি করে? কি করার আছে এই অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে? তর্ক নিয়ে এতই মশগুল আছেন যে, ভুলেও একবার তার কথাটা ভাবেন না। কি এত তর্ক করেন আপনারা? আপনাদের তর্ক শুনলেই আমার মাথা ধরে যায়। গা বমি-বমি করে। এ আর আমার সহ্য হয় না। মাকে পটিয়ে এবার আমিও এখানকার তল্পিতল্পা গুটোবার ব্যবস্থা করব। সভ্যতার মধ্যে অন্তত…'

'ভবিষ্যতের সভ্যতা', সঞ্জীব সকৌতুকে প্রতিমার কৃত্রিম অসন্তোষভরা মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'পাড়াগাঁয়েই গড়ে উঠবে। সভ্যতার মধ্যে বাস করতে হলে তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'সারা জীবন ধরে ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করে চরকা ঘুরোতে পারব না।'

'কেন নয়। চরকা থেকেই যদি বেশি আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয়, তবে ক্ষতি কি? যন্ত্র-সভ্যতা থেকে মানুষ কি সত্যিকারের আনন্দ পেয়েচে? মানুষের সুখের মাত্রা কি কিছু বেড়েছে? দরিদ্র-শোষণ, অতি-উৎপাদন, বেকার-বৃদ্ধি, জাতিতে জাতিতে লড়াই, বণিক-সভ্যতার এই তো…যাক্, তোমার সঙ্গে আবার একটা তর্ক তুলতে চাই নে, একেই যা চটে আছ! আমার জরুরি কাজ আছে, এবার চলি। সন্ধ্যাবেলা আবার আসব—তখন তোমার গান শুনব…'

'থাক্, দয়া করে' আর গানটা শুনতে হবে না।' প্রতিমা সাভিমান কণ্ঠে কহিল। 'কিন্তু এখন এমন কি তাড়াটা, শুনি? যেই না তর্ক বন্ধ হয়েচে, অমনি পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেচেন! সারাক্ষণ এত কি তর্ক করেন?'

'মহিমকে একবার যদি আমাদের সঙ্ঘের আদর্শটা বোঝাতে পারি, তবে আর তর্কের প্রয়োজন থাকবে না। ওর সক্রিয় সহায়তা পেলে তবেই জনকল্যাণের এমন দুঃসাহসিক পরীক্ষাটা সফল হয়ে উঠতে পারে…'

'কতটা বোঝাতে পেরেছেন?'

'বিশেষ নয়।' সঞ্জীব হতাশা-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল। 'ও চায়, যন্ত্রের আমদানি করতে, কারখানা ফাঁদতে। ওতে সুখবৃদ্ধি হবে না, সুখ নষ্ট হবে; গাঁয়ের শান্তি, গ্রামবাসীদের সরলতা পবিত্রতা নষ্ট হবে…কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি আর দেরি করব না। আমাদের নতুন তাঁতে আজ কাজ আরম্ভ হবে। এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। আর দেরি করলে আমার দেখাই হবে না।'

প্রতিমা এক সেকেণ্ড সঞ্জীবের উদ্বিগ্ন মুখটার দিকে চাহিয়া মোলায়েম গলায় কহিল, 'আমি কখনও কাপড় বোনা দেখি নি। তবে আমাকেও নিয়ে চলুন না। এখানে আমোদ-প্রমোদ তো কিছুই নেই, বরঞ্চ এ দেখে একটু আমোদ পাওয়া যেতে পারে।…গ্রামকে বাসযোগ্য করার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কি করা কর্ত্তব্য, জানেন? একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। নইলে, এই একান্ত একঘেয়েমির মধ্যে মাসের পর মাস কখনও থাকা যায়? চলুন, তবে আপনার তাঁতে কাপড় বোনাটাই দেখে আসি। আসতে পারি কি?'

সঞ্জীব এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিয়া একবার আকাশের সূর্য্যের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কি রকম কড়া রোদ উঠেচে, দেখতে পাচ্ছ?'

'তাতে কি? শীতের রৌদ্রে আমি গলে যাব না, ভয় নেই।'

'কিন্তু পায়ে হেঁটে যাবে? জমিদারের মেয়ের একটা সম্মান আছে তো?'

'বাবা আমাকেও সম্পত্তির একটা অংশ দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু খোঁড়া বলে নয়।'

'তবে যাও', নিরুপায় হইয়া সঞ্জীব কহিল, 'মায়ের অনুমতি নিয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

'আমি অনুমতি দিলেই যথেষ্ট হবে। আমি নিজেও তো একজন জমিদারণী!' প্রতিমা প্রায় ব্যঙ্গের সুরে কহিল। 'আপনি এমন সেকেলে! আপনার সব মতামতই সেকেলে—কি নীতির, কি অর্থনীতির!…এবার দয়া করে চলুন, আপনার এই নতুন আশ্চর্য্য প্রদীপটা দেখে একটু আনন্দ সংগ্রহ করে আসি…'

জমিদার-বাড়ির সমুখের পাকা সড়ক ছাড়াইয়া শীঘ্রই তাহারা কাঁচা রাস্তা ধরিল। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য আবার কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়া আল ধরিল। ধান কাটা শেষ হইয়াছে। শূন্য ক্ষেতে কাটা ফসলের গোড়াগুলি এখন অবজ্ঞাত হইয়া উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি উঠাইয়া নিজ ভাগ্যকে অভিসম্পাত করিতেছে। প্রতিমা কয়বার হুমড়ি খাইয়া ইহার উপর ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল; সঞ্জীব তৎপর না হইলে অভিসম্পাতের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইত।

কিছু গরু-বাছুর ক্ষেতের মধ্যে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া গোগ্রাসে খড় উপড়াইয়া খাইতেছে। কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই খড় কাটিয়া গাঁদা করা হইয়াছে। দু' একটা ক্ষেতে শীতকালীন শাক সব্জি সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া যতদূর চোখ পড়ে মাঠগুলি রিক্ততায় ধূসর। সর্ব্বস্ব দান করিয়া শস্যক্ষেত যেন অকস্মাৎ ফকির হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটিবার পর তাহারা ইস্কুল-বাড়ির কাছে পৌঁছিল, এবং মোড় লইয়াই 'গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘ' বোর্ড-আঁটা ফটকের সামনে হাজির হইল। সঞ্জীব সহাস্যে কহিল, 'ভেতরে এসো। স্বাগতম্।'

কিছু দূর হইতেই ঢোলের শব্দ শোনা যাইতেছিল, এইবার প্রতিমা তাহার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিল। একটা খোলা চালা-ঘরের মধ্যে বহু লোকের ভিড়। অনুমান হয়, ওখানেই তাঁতের পরীক্ষা চলিতেছে এবং ইহার সম্মানে সামনের খোলা জায়গাটায় একদল ঢাকী এবং ঢুলী নিজেদের অতিশয় শব্দশালী যন্ত্রগুলিতে মনের আনন্দে কাঠি পিটাইতেছে।

সঞ্জীব যে অতিশয় কৌতূহলী ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রতিমা সহজেই টের পাইল। তাহার মনোযোগ আর প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধ নাই, বরঞ্চ দল রাখিবার জন্য প্রতিমাকেই তৎপর হইতে হইল। সঞ্জীবকে অনুসরণ করিয়া সে ভিড়ের কাছে আগাইয়া গেল।

নিমেষে 'দা' ঠাকুর অ্যায়েচেন, দা-ঠাকুর অ্যায়েচেন' রব পড়িয়া গেল। যেন মন্ত্রে ভিড় ফাঁক হইয়া গেল। সেই পথে সঞ্জীব দ্রুত তাঁতের কাছে উপস্থিত হইল।

'এই যে, স্যার, আসুন,' একটা বারো আনা চার আনা চুল-ছাঁটা, হাফ্‌প্যাণ্ট ও হাফ্‌-শার্ট পরা ঢেঙা লোক মুখ হইতে বিড়িটা হাতে স্থানান্তরিত করিয়া আগাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল। 'আপনার দেরি দেখে আমরাই শুরু করে' দিইচি। একটার মোদ্দে বেরিয়ে না পড়লে দুটোর লোক্যাল ধরতে পারব না। আমি থাকি গিয়ে আপনার চেৎলায়। বিকেলের গাড়িতে গেলে দেরি হয়ে যাবে ; হাওড়া পৌঁছতেই সন্দে!···দিইচি, স্যার, আপনার লোককে ঠিক-ঠিকটি শিখিয়ে দিইচি, কোনও ভাবনা করবেন না। আমাদের কোম্পানীর কাচে আপনি ফাঁকি পাবেন না।'

সঞ্জীব পরম আগ্রহ সহকারে তাঁতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। একটা চমৎকার চওড়া পাড়ের ডিজাইন ইতিমধ্যেই আংশিক বোনা হইয়া গিয়াছে। সজ্ঘের ওস্তাদ তাঁতী পতিতপাবন গামছা-কাঁধে সগর্বে তাঁতের সম্মুখে বসিয়া মাকু মারিতেছিল, কৃতিত্বের পুলকে সমস্ত দাঁতগুলিই

বিকশিত করিয়া সঞ্জীবের দিকে চাহিয়া কহিল, 'হেঁ হেঁ, দা'ঠাকুর, হেঁ হেঁ…'

'ঠিক মত শিখে নিয়েচ তো, পতিতপাবন?' সঞ্জীব উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করিল। 'কলকাতার মিস্ত্রী তো রোজ রোজ আনা যাবে না, যদি কোনও জায়গায় সন্দেহ থাকে, ভালো করে' বুঝে নাও।'

'খুঁটিনাটি অবধি ওকে শিখিয়ে দিইচি, স্যার; আপনি কোনও ভাবনা করবেন না।' বারো আনা চার আনা চুলের মালিক কলিকাতার মডার্ণ হ্যাণ্ডলুম্ কোম্পানীর নিজস্ব মিস্ত্রী অভয় দিয়া কহিল। 'আমি সে রকম লোক নই, মোসাই। কিছুটা হাতে রাখব, আবার এসে একটা ফিস্ আদায় করব, আমি তেমন মানুষ নই। নিতান্ত অভাবে পড়েই এ-কাজ নিইচি, নইলে আমরা স্যার বড় বংশের ছেলে। আমার দাদামোসাই চেৎলার বাজারে তিন-তিনটে দোকানের মালিক ছেলেন। ছল-চাতুরি আমার ঠেঙে পাবেন না।'

লোকটার বেশি কথা বলার বাতিক সঞ্জীব ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছে।

পতিতপাবন সলজ্জভাবে কহিল, 'পারব, ঠিক পারব, দা'ঠাকুর। মনে হচ্ছে পারব।' বলিয়া কাজে ইহার প্রমাণ দিবার জন্যে সে আরও জোরে মাকু ছোঁড়া আরম্ভ করিল। দর্শকের এমন একটা ভিড়ের সম্মুখে নতুন তাঁতটা চালাইতে পারিয়া সে নিজেকে প্রথম রেল ইঞ্জিনের একমাত্র চালকের মতো গৌরবান্বিত বোধ করিল!

'বাঃ, সুন্দর হয়েচে তো, পাড়টা!' সঞ্জীব বারবার পাড়টার এক অংশ আঙুলের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিল। 'এমন পাড় দেখলে শহুরে মেয়েরা যে এ শাড়ি লুফে নেবে, কি বল, প্রতিমা?…আরে, সে গেল কোথায়!…' বলিয়া সঞ্জীব ভিড়ের দিকে তাকাইল। চারিদিকে সরল গ্রাম্য লোকেরা নতুন তাঁতের কেরামতি লক্ষ্য করিয়া কলগুঞ্জন শুরু করিয়াছিল,

ছেলেপিলেরা উল্লাসে হাততালি দিতেছিল, ঢুলীরা ঢোল পিটাইতে পিটাইতে নাচানাচি আরম্ভ করিয়াছিল। দা'ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া এক বৃদ্ধ ভিড়ের পিছন দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, 'দিদিমণি অ্যাখানে দা'ঠাকুর।'

'এ কি প্রতিমা, তুমি পেছনে দাঁড়িয়ে কেন!' সঞ্জীব তাড়াতাড়ি কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল।

'আপনি আমাকে যেখানে বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁত দেখতে ছুটে গেলেন, আমি ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। ক্যাসাবিয়েঙ্কার নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

'তোমার কথা ভুলেই গিছলাম।' একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া সঞ্জীব অভিযোগটা স্বীকার করিল। 'দেখতো কাণ্ড! আমার আতিথেয়তায় প্রথমেই ত্রুটি বেরিয়ে পড়ল! ত্রুটি মার্জ্জনীয়—বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিগুলি থেকে এই সুবিধাজনক 'ফ্রেইস্'টা ধার করা হচ্চে। এসো, দেখবে এসো।...'

তাঁত-চালনা দেখা সমাপ্ত করিয়া সঞ্জীবের সাথে প্রতিমা ভিড়ের বাহিরে আসিল। বিলম্ব না করিয়াই কহিল, 'এই শাড়িটা আমার চাই। সঙ্গে টাকা নেই বলে বায়না দিতে পারছি না, কিন্তু মৌখিক অর্ডারটা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য হবে না। তবে দয়া করে, বেশি দাম চেয়ে যেন ঠকাবেন না।'

'না হয় পাড়াগাঁয়ের দুঃখীদের উপকার করবার জন্য একটু ঠকলেই', দুই সারি চালা-ঘর এবং শণ-ছাওয়া কুটিরের মধ্যবর্ত্তী চওড়া ফুল গাছের পাড়-বসান পথ দিয়া চলিতে চলিতে সঞ্জীব কহিল।

'কার ডিজাইন এটা?'

'ঐ', আঙুল তুলিয়া সঞ্জীব সমুখের চালা-ঘরটার দিকে নির্দ্দেশ

করিল। 'দেখবে চল। লোকটি খাঁটি শিল্পী। মাটির কি চমৎকার পুতুলই তৈরি করে!'

টিনের চালার নিচে এক তাল মাটি লইয়া গঙ্গারাম কুমোর কাজে ব্যাপৃত ছিল। হাতে কাঁচা মাটির একটা ঘট; আঙুল টিপিয়া সে ইহার আকার এবং গায়ের নক্সা পরিবর্ত্তন করিতেছে। চারিদিকে নানা প্রকারের পুতুল ও মাটির ছাঁচ। পাঁচ-সাতটা মুচিতে পাঁচ-সাত রকমের রং গোলা। দুটি ছোট কলসীতে সাজিমাটি লেপিয়া তাহার উপর নক্‌সা আঁকা হইয়াছে। রঙের বিন্যাস এমন পরিপাটি যে কাঁচা রঙ বলিয়া মনেই হয় না।

গঙ্গারাম নিজের কাজে নিবিষ্ট ছিল; এমন সময় গায়ের উপর একটা ছায়া লক্ষ্য করিয়া সে উপর দিকে চাহিল এবং সঞ্জীবকে আবিষ্কার করিয়া শিল্পী-সুলভ মর্য্যাদার সঙ্গেই কহিল, 'পেন্নাম হই, দা'ঠাকুর। আপনার জন্যে কলসী দুটো রং করে রেখেছি। কাজ শেষ হলে পৌঁছে দিয়ে আসব'খন। রজনীগন্ধার ফুল রাখলে বেড়ে মানাবে দেখবেন।'

'ভারি সুন্দর রং হয়েচে তো, গঙ্গারাম!' সঞ্জীব মুগ্ধ হইয়া কহিল। 'রসো, এ দুটো এর কাছে বেচে দিই। রোজ এমন খদ্দের পাওয়া যাবে না।' বলিয়া সঞ্জীব সকৌতুকে প্রতিমার দিকে তাকাইল।

এইবার গঙ্গারামের দৃষ্টিও প্রতিমার দিকে পড়িল। কুণ্ঠিতভাবে সে কহিল, 'আজ্ঞে, এ কি বলচেন, দা'ঠাকুর। শখ করে বানিয়েচি, এর জন্য কি পয়সা নিতে পারি? দিদিমণি দয়া করে নিন না, নিলেই খুশি হয়ে যাব!'

'তা কখনও হয় গঙ্গারাম।' প্রতিমাও এইবার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'দামি জিনিষ কি দাম ছাড়া নেওয়া যায়। ভারি সুন্দর হয়েছে! কি চমৎকার নক্সা! আরও দুজোড়া আমাকে তৈরি করে দিতে

হবে ; কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেব···' বলিয়া কলস দুটি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

'আজ্ঞে, এ দিদিমণিটা কিনি, দা'ঠাকুর ?' গঙ্গারাম গদগদভাবে সঞ্জীবের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল। 'গরিব-দুঃখীর সঙ্গে এমন মিঠে করে কথা বলেন ! আজ্ঞে, জমিদার বাড়ির কেউ লয় তো ?'

'বাঃ, এইতো চিনে ফেলেচ।' সঞ্জীব সহাস্যে কহিল। 'এর পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাদের কাছ থেকে বহু খাজনা আদায় করেচে, এইবার তোমার সুযোগ। যতটা বেশি পারো আদায়···'

যথাসাধ্য বেশি আদায় করা দূরের কথা, প্রতিমার পূর্ব্বপুরুষদের নিষ্পেষণের সকল ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া গঙ্গারাম কুমোর দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং সবিনয়ে দণ্ডবৎ হইয়া কহিল, 'ইটি বলবেন না, দা-ঠাকুর। দুটো হাঁড়িকুড়ির জন্যে মালিকের কাছ থেকে আমি দাম নিতে পারব না, দা'ঠাকুর !'

গঙ্গারাম কুমোরের শিল্পশালা হইতে বাহির হইয়া সঞ্জীব প্রতিমাকে সঙ্ঘের অন্যান্য কর্ম্মের ঘাঁটিগুলি ঘুরাইয়া দেখাইল। বিভিন্ন কুটির, চালা এবং গুদামঘরের গায়ে কালো রঙকরা কাঠের ফলকে ইহাদের পরিচয় লেখা আছে। 'সমবায় বীজশস্য ও ভূমিসারের গুদাম' 'সমবায় বিক্রয় পরিষদ', 'সমবায় ঋণদান কার্য্যালয়, 'সমবায় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সভা' ইত্যাদি বিবিধ সমবায় প্রতিষ্ঠান সারা কেন্দ্রটিকে নামাবলীর মতো ছাইয়া রাখিয়াছে।

অবশেষে প্রতিমা কহিল, 'চলুন, এইবার আপনার নিজস্ব কুটিরটি একবার দেখে আসি। দাদার কাছে এর যা চমকপ্রদ গল্প শুনেচি, তাতে আগ্রহ না বেড়ে পারে না। 'শ্যামলী' 'পর্ণপুট' বা ঐ রকম কোনও সম্ভ্রান্ত নাম দিলে ভালো করতেন। মাটির ঘর জাতে উঠে একেবারে স্বপ্নের বাসা হয়ে উঠত।'

'স্বপ্নের বাসাই বটে।' সঞ্জীব পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল। 'চল,

দেখবে। আমাদের কবি গণেশ সামন্ত হয়তো এতক্ষণে এসে বসে আছেন। নিজে কবিতা লেখার চেয়ে গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। নানা দুর্গম এবং অবিশ্বাস্য জায়গা থেকে রোজই সে নতুন নতুন পদ, নতুন ছড়া, নতুন গীত সংগ্রহ করে আনে। রোজ এগুলি আমাকে ধৈর্য্য ধরে শুনতে হয়। এদের প্রতি সামান্যতম ঔদাসীন্য দেখালেও সামন্ত-মশায় আহত হন। নিজের লেখা কবিতা না হলেও এদের প্রতি তার মমত্ববোধ···এই যে, কেষ্টর মা, আজ খাওয়াচ্ছ কি? কেষ্টর মা অন্নদাত্রী। প্রত্যহ আমাকে রান্না করে···'

'কি যে বল, দা'ঠাকুর', বুড়ি কেষ্টর মা বিব্রত হইয়া পড়িল। 'তোমার দয়ায় খেয়ে পরে বেঁচে আছি, আর সব্বার কাচে বলে বেড়াবে, কেষ্টার মা আমার অন্নদায়ী। কেষ্টার মা'র সে বরাতই বটে। স্বামী সগ্‌গে গেল; এত বড় ছেলেটা বুড়ি মায়ের দিকে একবার চাইলে না, একেবারে দেশান্তরী হয়ে গেল। তা সে যখন মায়া করলে না, আমি বা কেন মিছে কেঁদে মরি! কিন্তু ঐখেনেই তো মুস্কিল। সে যা পারে, আমি তা পারি কই···ঐ যা, আবার নিজের কথা বকে চলেছি। এইবার তাড়াতাড়ি চান করে নাও দিকিনি, দা'ঠাকুর। এই যে নিত্যিনিত্যি অনিয়ম চলচে, সময়-অসময় নেই, যেমন ইচ্ছে ছুটে এলে, একটু জিরুনো নেই, ঠাণ্ডা-সুস্থ হওয়া নেই, ছোঁ মেরে নাকে-মুখে চারটি ভাত গুঁজে নিলে, বলি এতে কি শরীল টেঁকে! কথায় বলে তেলে জলে শরীল! এ সামলানো কি আমার সাধ্য! ঘরে বউ আসতো তো সব শোধরাত, সব গোছগাছ হ'তো···' বলিয়া সে আড়চোখে একবার প্রতিমার দিকে তাকাইল।

'যথেষ্ট বক্তৃতা করেচ, কেষ্টর মা, এইবার একটু থাম।' সঞ্জীব গম্ভীরভাবেই কহিল। 'গণেশ সামন্ত এসেচে কি?'

'তা আর আসে নি! দুঘণ্টা হলো এসে ওৎ পেতে বসে আচে।'

কেষ্টর মা আর একপ্রস্থ বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইয়া কহিল। 'পোড়া মিন্‌সের না আছে সময়জ্ঞান, না আছে মুখের কামাই। একরাশ পোড়ার কাগজ আস্তাকুঁড় ঘেঁটে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকর-বকর করবে! এত কথাও একটা মানুষে বলতে পারে! আর তুমিও দা'ঠাকুর, আস্কারা দিতে বড় কম নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ছড়া গিলচ। মা গঙ্গা জানেন, এতে কি সুখ পাও। ইদিকে দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে যায়, সূয্যিঠাকুর পাট বদলে বসেন।...হ্যাঁ, বসে আচে, নিত্যিকারের মতো মুখপোড়া আজও বসে আচে...'

আর কথা না বাড়াইয়া সঞ্জীব প্রতিমাকে তাহার শণের ঘরটার দিকে লইয়া চলিল। বলিল, 'বেচারি বড় দুঃখ পেয়েচে। ছেলেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার পর থেকেই মাথার এই গোলযোগ। কিন্তু বড় বিশ্বাসী, বড় নির্ভরযোগ্য।...দেখচ তো, কুটির-দ্বারে কি রকম চিত্র আঁকা? এও গঙ্গারামের কাজ। ভেতরে চল, মাটির দেওয়ালে কিছু স্থানীয় ফ্রেস্কোও দেখতে পাবে...'

ভিতরে কবি গণেশ সামন্ত নীরবেই বসিয়াছিল, সঞ্জীব ও প্রতিমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিনীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মধ্যবয়স্ক লোকটি। আকারে বেঁটে ধরণের, মাথায় একরাশ কাঁচা-পাকা চুল। পুরু গোঁফের প্রত্যন্তভাগ ঝুলিয়া পড়িয়া ঠোঁটের দুইপ্রান্ত স্পর্শ করিয়াছে। অনেক দিন দাড়ি কামানো হয় নাই। পায়ে ছেঁড়া চটি, পরণে মোটা, আধ ময়লা, হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধুতি, গায়ে বিবর্ণ তালি দেওয়া কামিজ। একগাদা বাদামী রঙের বালি কাগজ এমন ভাবে বগলে চাপিয়া বসিয়া আছে যে, অমূল্য রত্ন রক্ষা করিবার জন্য সে যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

'আজ নতুন কিছু সংগ্রহ হলো ?' সঞ্জীব প্রশ্রয়ের সদয় কণ্ঠে কহিল।

'আজ্ঞে, তা এনেচি। এনেচি। তা প্রায় দুশো আড়াই-শো পদ হবে।' গণেশ সামন্ত উৎসাহিত হইয়া প্রদীপ্ত মুখে কহিল। 'একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি কাব্য! এতে সন্দেহমাত্র নেই। স্বভাব-কবির সহজ পদ! হাঁসুলি-গাঁয়ের গোবিন্দ প্রামাণিকের দাদামশাই পদকারক ছিলেন বলে আগেই সংবাদ পেয়েছিলাম! কাল সন্ধ্যের পর সেখানে হাজির হয়ে তাকে চেপে ধরলাম। সহজে কি বার করতে চায়! অমূল্য ধন সবাই গোপন করে রাখে। গোবিন্দ প্রামাণিকের দাদামশাই উদ্ধব প্রামাণিক মা মুক্তেশ্বরীর সাধক ছিলেন। ৺মায়ের উদ্দেশে বহু পদ বেঁধেছিলেন।...গোবিন্দ প্রামাণিক দেবে না, আমিও ছাড়ব না। তার-পর সারারাত জেগে পদগুলি নকল করে নিয়ে এসেচি। শুনবেন, দুএকটা পড়ে শোনাব ?'

প্রতিমা ইতিমধ্যে কবির দিক হইতে নজরটা গৃহ-সজ্জার দিকে নিবদ্ধ করিয়াছিল। একদিকে একটা অপরিসর তক্তপোষে সঞ্জীবের বিছানা সবুজ খদ্দরের আচ্ছাদনীতে ঢাকা। মাথার কাছে একটা টেবিলে কেরোসিনের একটা ডোম-ওয়ালা বড়ো টেবিল-ল্যাম্প। ঘরের অপর প্রান্তে লিখিবার টেবিল; তাহাতে ঘষা-কাচের দোয়াতদানি ও লিখিবার কিছু কাগজ। দক্ষিণ-মুখী বড়ো জানালাটার কাছে ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারা। তাহার পাশে চামড়ায় মোড়া কতগুলি বেতের মোড়া। হাতের নাগালের মধ্যে একটা কাঠের বুক-কেস্। একদিকের দেওয়ালে ত্রিভুজ আকারে টাঙানো রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও বিবেকানন্দের তিনটি বাঁধানো ছবি; ফটো নয়, হাতে আঁকা। ইহার উল্টা দিকের সারা দেওয়ালটা জুড়িয়া গঙ্গারামের আঁকা 'স্থানীয়' ফ্রেস্কো। রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ক্লিষ্ট অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিতেছেন, 'ক্লৈবং মাস্ম গম পার্থ।'

কুটিরের অভ্যন্তরের এই পরিচ্ছন্নতায় প্রতিমা আবাক হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সঞ্জীবের প্রতি কবি গণেশ সামন্তের সানুনয় আবেদনটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এইবার পদ্য পাঠ শুরু হইবে না কি! তবেই সারিয়াছে। বেলা কম হয় নাই। এইবার বাড়ি না ফিরিলে মায়ের বকুনি খাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি সভয়ে সে সঞ্জীবের দিকে তাকাইল।

'আজ আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, সামন্তমশায়।' সঞ্জীব কবিবরকে হতাশ এবং প্রতিমাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল। 'এঁকে প্রথমে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। অনেক বেলা হয়েছে, এখনও ইনি অভুক্ত আছেন, অথচ আমার বাড়িতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে এঁকে…'

'তা বৈ কি, তা বৈ কি।' বলিয়া গণেশ সামন্ত যেন নিজেকেই অপরাধী বোধ করিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। 'আজ্ঞে, না, আমার কোনও তাড়া নেই। আপনি যান। আমি অপেক্ষা করচি। আপনাকে শুনিয়ে তবে উঠব। তখন বুঝবেন, বন জঙ্গল ঘেঁটে কি মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করে এনেছি। একেবারে খাঁটি কাব্য, নির্ভেজাল কাব্য! যান। আপনি যান। দিদিঠাকরুণকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসুন। কতক্ষণই বা, আমি বরঞ্চ পদগুলি আর একবার দেখে নিই। তাতে পড়ে শোনাতে সুবিধে হবে…'

কিন্তু খুব অল্পক্ষণ সামন্ত-মহাশয়কে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। জমিদার বাড়ির সিং-দরজার কাছে পৌছিয়া প্রতিমা সহসা প্রত্যাবর্ত্তন-উদ্যত সঞ্জীবের জামার হাতা টানিয়া ধরিল। কহিল, 'এতো বেলায় কিছুতেই না-খেয়ে ফিরতে পারবেন না। কোনও যুক্তি আমি শুনতে চাই নে। লক্ষ্মী ছেলের মতো সঙ্গে আসুন।'

'এ কি পাগলামি।' সঞ্জীব সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল। 'সত্যি বলচি,

আমার মোটেই খিদে পায় নি। গাঁয়ের আমরা সবাই খুব দেরিতে

'যথেষ্ট হয়েচে। গ্রামের আপনাদের পক্ষেও বেলাটা খুব কম হয় নি।' প্রতিমা তিরস্কারভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল। 'দেখি, কেমন আপনি না আসেন। তবে আমিও আপনার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যাব।'

সঞ্জীব নিরুপায় হইয়া হাল ছাড়িল। কহিল, 'আগের মতোই পাগল আছ, দেখচি। আচ্ছা, চলো। কপালে আজ নেহাৎই রাজভোগ আছে!'

চার

গত কয়দিন তর্ক বন্ধ ছিল। কাজের চাপে সঞ্জীব এদিকে আসিতে পারে নাই এবং মহিম কাছারি দালানে জমিদারি-সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল। আজ নবান্ন। গত সপ্তাহাধিক কাল ধরিয়া ব্রজময়ীর পিঠার তোড়জোড় চলিতেছিল, আজ সেই বিরাট আয়োজন হাজার রকম মিষ্টান্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার সম্মানেই সঞ্জীবকে আসিতে হইয়াছে। নবান্নের পিঠা পেটে যাইবার পর দুই বন্ধুর তর্ক-স্পৃহা আবার চাড়া দিয়া উঠিল।

রামু বেয়ারা ইতিমধ্যেই ড্রয়িং-রুমে বার-তিনেক চা পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। আরও কতবার এই পানীয়টি সরবরাহ করিতে হইবে তাহা নিশ্চিত না জানায় বেচারি মনোযোগ শ্লথ করিতে পারিতেছে না। সূর্য্য মাত্র সজনেহাটার খেজুর বনের উপর কাৎ হইয়াছে; এখনও সন্ধ্যা হইতে দেরি আছে। রামু লক্ষ্য করিয়াছে, সঞ্জীববাবু বেড়াইতে আসিলেই দাদাবাবুর চা-তৃষ্ণা এমন বেয়াড়া রকম বাড়িয়া ওঠে, নহিলে বৈকালে তিনি দুই পেয়ালা চাও পান করেন না। চা-প্রচার পরিষদের বিজ্ঞাপন না পড়ায় সে বেচারি জানে না যে, চা ধৃতি-বৃদ্ধির সহায়তা করে, এবং তর্কে জিতিতে হইলে তাহা কতখানি প্রয়োজন!

এই তর্কের মধ্যখানেই প্রতিমা যাইয়া সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। কহিল, 'আবার শুরু করেচেন! কি বকর-বকরই আপনারা করতে পারেন।···ইলার কাছ থেকে চিঠি এসেচে, দাদা। এই দেখো। লিখেচে, ও নাকি বিলেত যাওয়ার চেষ্টা করচে। কিছুই ওর ভাল লাগচে না। এ-রকম 'ডাল্' লাগলে নাকি বিলেত যাওয়াই সবচেয়ে উপকারী!

আচ্ছা, বলুন তো সঞ্জীববাবু, কি এমন খারাপ মেয়ে ইলা? নাচলেই সে মেয়ে খারাপ হয়ে গেল? দাদাকে কত বলি, ইলা চৌধুরির মতো ক'টা সুন্দরী, অ্যাকম্‌প্লিশ্‌ড্‌ মেয়ে পাবে। ঐ দেখচেন, নাক সিঁটকোচ্চে! আপনিও তো দেখেচেন ইলাকে আমাদের কলকাতার বাড়িতে, বলুন তো, সে কি কিছু খারাপ? সাজলে গুজলেই বুঝি মন্দ হয়ে গেল!...দাদা এমন না করলে বেচারিকে আর বিলেত ছুটতে হ'তো না। লিখেচে, 'তোরা গাঁয়ে গিয়েচিস শুনে এমন লোভ হচ্চে! কদ্দিন থাকবি?...মাত্র গাঁয়েই মানুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসতে পারে। ফার্‌ ফ্রম্‌ দি ম্যাডিং ক্রাউড একটা মস্ত সত্য কথা। পাখির গান, গাছপালার মর্ম্মর, শস্যের সুগন্ধ, গরুর হাম্বা...ঈস্‌, বেচারিকে যদি লিখি, এক্ষুনি এসে হাজির হয়।' বলিয়া প্রতিমা মহিমের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ সস্মিত দৃষ্টিপাত করিল।

'যথেষ্ট হয়েচে, এইবার থাম।' মহিম কিছুটা বিব্রত ভাবে কহিল। 'প্রকৃতির সংস্পর্শ! ভণ্ডামির একটা মাত্রা থাকা উচিত। চেহারায় এবং চাল-চলনে প্রকৃতির সকল সংস্পর্শ দূর করাই যার একমাত্র প্রচেষ্টা, তার এত সব ন্যাকামি না করলেই ভালো হ'তো।'

'দেখচেন!' প্রতিমা সঞ্জীবের দিকে চাহিয়া তাহার নিকট প্রতিবাদ জানাইল। 'কিছুই যদি ওর দেখতে পারে। ওর সব দোষ। না হয় বেচারি সাজ-পোশাকে একটু বেশি ফিরিঙ্গিয়ানা করে, কিন্তু আজকাল কম-বেশি সেটা আর কে না করচে, বলুন? তা বলে পাড়াগাঁ ভালো লাগতে পারে না? ওর দাদামশাই তো সাতদীঘের জমিদার। তার কাছে ইলা ফি বছর বেড়াতে যায়, ফি বছর...'

'তা যাবে বৈকি!' মহিম সব্যঙ্গে কহিল, 'নইলে বাবুগিরির টাকা সংগ্রহ হবে কোত্থেকে? বিলেত যাচ্ছেন! বিলেত যেতে টাকা লাগে। তার একমাত্র উৎস এই দাদামশাই। তাকে তোয়াজ করতে হলে এখানে

নয়, সাতদীঘেতেই যেতে হবে। সেই পরামর্শ দিয়ে একটা চিঠি লিখে দিস।'

'বাঃ রে, দাদামশাইয়ের টাকা নিলে ভারি যেন অপরাধ হলো।' প্রতিমা প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'বাপের টাকা না থাকাই তা হলে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ! ওর সব কিছুই খারাপ! আমার বন্ধু বলেই তুমি ওকে দুচোখে দেখতে পার না, নইলে...'

'এতক্ষণে ঠিক বলেচিস!' এইবার মহিম হাসিয়া উঠিল। 'তা বেশ, তাকে না হয় আসতেই লিখে দে। সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখ। আমার কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা না করলে আমার ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ থাক্‌বে না। বরঞ্চ সঞ্জীবের 'আশ্রমে'র সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিস্; গ্রাম এবং গ্রাম্য-শিল্পের সংস্পর্শে এসে প্রভূত আনন্দ লাভ করবে। এবং পক্ষান্তরে চরকা এবং কুটির-শিল্পের আর একজন সমর্থক বাড়া অসম্ভব নয়।' বলিয়া সে পরিহাস-দীপ্ত তৃপ্ত মুখে সঞ্জীবের দিকে তাকাইল।

'নমস্কার। আমার ঘাট হয়েচে। কুটির বা কারখানা, কারুর সঙ্গেই আমার সংযোগ করিয়ে দরকার নেই।' বলিয়া অসন্তুষ্টমুখে প্রতিমা পিছন ফিরিল। মায়ের সম্মানে আজ সে বিশেষ সাজ-পোশাক করিয়াছে। গলায় মুক্তা-খচিত নতুন হার, খোঁপায় ফুলের মঞ্জরী, পরণে স্বরার রঙের শাড়ি। ইলার চিঠিটাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে তর্কে বাধা দিতে আসিয়াছিল। দাদা বা সঞ্জীববাবু কাহারও কাছ হইতেই তাহার কাজের সমর্থন না পাইয়া সাজসজ্জা এবং দেহভঙ্গির একটা হিল্লোল তুলিয়া সাভিমানে সে বৈঠকখানা ত্যাগ করিল।

'আমার কথা শোন্, সঞ্জীব।' মহিম এইবার 'ডিভানের' উপর সোজা হইয়া বসিয়া নিজের যুক্তিকে গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা করিল, এবং প্রায় আবেদনের স্বরে কহিল, 'তুই এতে রাজি হ'। এতে আমাদের সকলেরই ভালো হবে। ইণ্ডাস্ট্রি না বাড়ালে দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না।

তোর কেশবকে মনে আছে? আমাদের দুতিন ক্লাস নিচে পড়ত। ম্যানচেস্টারে এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গিয়েছিল।—কিছুদিন আগে হঠাৎ কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা। আমার প্ল্যান শুনে তখনই সে মহা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ক'দিনের মধ্যেই ডিটেইল্‌ড্‌ প্ল্যান এনে হাজির করলে। তার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আলোচনা করা হলো। ওর যে শুধু টেক্সটাইল এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটা ডিগ্রি আছে তাই নয়, বয়নবিদ্যায় ওর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রচুর। তা ছাড়া, সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংও তো ওর খানিকটা জানা আছে; শিবপুরে দু বছর পড়েছিল। সব দিক থেকেই চমৎকার লোক পাওয়া গেছে।...আয় সঞ্জীব, আর আপত্তি করিস নে। কাল দুপুরের আগেই কেশব এসে পৌঁচচ্ছে। সবাই মিলে পরামর্শ করে কর্তব্য স্থির করে ফেলা যাক। আমি, প্রতিমা, তুই আর কেশব, এই চারজনে কোম্পানী গঠন করি। কেশব হবে আমাদের এক্‌সপার্ট, আর তুই আমাদের কণ্ট্রোলার, আমাদের ফিলজফার। দেশের সাধারণ লোকের দারিদ্র্য দূর করাই হবে আমাদের আদর্শ। অর্থাৎ, তোর আদর্শ ই আমাদের কোম্পানীর আদর্শ হবে...'

সঞ্জীব কিছুক্ষণ ইহার কোনও জবাব দিল না, যেন জবাব দিবার বল-সংগ্রহ করিতে লাগিল। তারপর ক্লিষ্টস্বরে ধীরে ধীরে কহিল, 'আমাদের দেশের মতো কৃষি-প্রধান দেশের মুক্তি মেশিনের মধ্য দিয়ে আসতে পারে না, এটা শুধু আমার থিয়োরি নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোর প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কি করে করি বল্‌? কারখানার আমদানি করে' দেশের শান্তি নষ্ট করার পক্ষে আমি কিছুতেই মত দিতে পারব না। চিম্‌নির ধোঁয়ায় এত বিষ বেরিয়ে আসে যে...'

'প্রস্তাবটা তুই আরও তলিয়ে ভেবে দেখ, সঞ্জীব।' মহিম প্রায় অনুরোধের সুরে কহিল। 'একটা বাঁধা বিশ্বাসের দরুণ একে সরাসরি

বাতিল করিস না। তুই শুধু আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু নস্, জমিদার-তনয়ের অলস জীবনে একটা বড় আদর্শ, একটা বড় 'মিশনে'র আগুন পর্য্যন্ত ছুঁইয়ে দিয়েচিস। বিশ্বেস কর, এই কারখানা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্জ্জলা স্বার্থপরতা নয়। আমি চাই দেশবাসীর উপকার করতে, আমি চাই··· কিন্তু আমার কথা যাক্। কেশব খুব যুক্তি দিয়ে কথা কইতে পারে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের সমর্থনে তার উৎসাহ এবং যুক্তি দুই-ই এত প্রচণ্ড যে, এ ভারটা আমি নিশ্চিন্তে তার হাতে ছেড়ে দিতে পারি।' বলিয়া সে মিটিমিটি হাসিল।

'যুক্তিগুলি সবই আমার জানা আছে।' সঞ্জীব জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিরাসক্ত কণ্ঠে কহিল। 'খুব কাছাকাছি থেকে কারখানা-জীবনকে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে। লোভ, হিংসা, দ্বন্দ্ব সারাক্ষণ সেখানে আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শ্রমিক এবং ধনিক, যারা খাটে এবং যারা উপসত্ব ভোগ করে, কেউই প্রকৃত আনন্দ পায় না। তারপর হঠাৎ একদিন কারখানার দেওয়ালের ভিতর যে যন্ত্র-দানব বন্দী থেকে সারাক্ষণ গর্জ্জন করে সে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে···'

'দৈত্যকে শিকল পরিয়ে কাজে লাগাতে পারলে অনেক বেশি কাজ আদায় করা যায়, সঞ্জীব। দৈত্য দেখে ভড়কে গেলে চলবে কেন। আমাদের যুগ তাকে আয়ত্তে আনবার ভার নিয়েচে। তুই কি এখনও চরকার যুগে পড়ে থাকবি?'

'ক্ষতি কি?' সঞ্জীব কহিল। 'যন্ত্র-দৈত্যকে মানুষ আয়ত্তে আনতে পারেনি শুধু তাই নয়, মানুষের লোভের দৈত্যটাকে পর্য্যন্ত সে জাগিয়ে তুলেচে। যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপিটেলিজমের আবির্ভাব, স্বার্থের হানাহানির সূত্রপাত, বস্তির জন্ম, নোংরামির জন্ম। কি দরকার গাঁয়েতে কলের আমদানি করার। খাল কেটে কুমীর ডেকে লাভ কি? গ্রামজোড়া শান্তির মধ্যে হঠাৎ···'

কিন্তু তর্কটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মুখে রাজ্যের সমস্ত অধৈর্য্য প্রকটিত করিয়া প্রতিমা আবার আসিয়া হাজির হইল। কহিল, 'এখনও শেষ হয়নি? ব্যস্‌, আর নয়, এইবার থামুন। দাদাকে একবার তর্কের অভ্যাস ধরিয়ে দিলে শেষে আমাকেই তার হাঙ্গামা পোহাতে হবে! যান্‌, মা আপনাকে ডাকচেন। তাঁকে যদি একটু ভালো করে' ফোলাতে পারেন, চাটুতে ভাজা কথা শোনাতে পারেন, তবে চাই কি আপনার ইস্কুলের জন্য মোটা রকম চাঁদা আদায় হ'তে পারে। আমিই অনেকটা তৈরি করে' রেখে এসেচি। কিন্তু আর দেরি নয়। একটু পরেই তিনি আহ্নিকে বসবেন। তখন দুঘণ্টা অপেক্ষা করলেও দেখা মিলবে না…'

'তবে আর দেরি করিসনে।' মহিমও সকৌতুকে কহিল। 'বরঞ্চ আমি দৌড়তেই উপদেশ দেব। মায়ের ইচ্ছা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লায়। এমন সদিচ্ছাটা কখন বদ্‌লে যাবে ঠিক কি? আমিও উঠি। সেরেস্তায় গিয়ে একবার বসতে হবে…'

'আর আমি যাই, নির্জ্জনতা উপভোগ করি গিয়ে।' বলিয়া প্রতিমা সকলের আগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ

'প্রতিমা।'

'আরে! এরই মধ্যে আপনার হয়ে গেল! কই, সামান্য দুঘণ্টাও তো লাগল না।'

'লাগত,' খুসি-মাখানো স্বরে সঞ্জীব কহিল, 'কিন্তু তোমার মাকে আহ্নিকে যেতে হলো, আর দেরি করতে পারা গেল না।' বলিয়া সঞ্জীব রাস্তা হইতে বেদীর সিঁড়িতে পা দিল।

প্রায় আধঘণ্টা হইল পদ্মবনের সমুখের এই শাদা বেদীতে প্রতিমা শিবির স্থাপন করিয়াছে। সঞ্জীব এবং মহিম স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্থান করিবার পর সে নিজের শোবার ঘরে যাইয়া কিছুক্ষণ সেতারে পিড়িং পিড়িং করিল। কিন্তু যন্ত্রটার ভাষা যতই মিঠা হোক, ইহার সহিত বাক্য-বিনিময় চলে না, এক-তরফা ইহার গুঞ্জন শুনিতে হয়। ফলে, শীঘ্রই প্রতিমার সহিষ্ণুতার অবসান ঘটিল। বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উজ্জ্বল তরুশির এবং অন্ধকার তরুছায়ায় বাগানটা বিচিত্র মনে হয়। খালের পাড়ের প্রকাণ্ড বকুল গাছটার উপর দিয়া বাঁকা চাঁদ সামান্য একটুখানি উঁকি মারিয়াছে; যেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবার আগে অবস্থাটা অনুকূল কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছে। এ সমস্তই প্রতিমাকে আকর্ষণ করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খালের কাছে একা একা যাইবার সাহস হইল না, মন্দের ভালো হিসাবে পদ্মবনের নিকটবর্ত্তী বেদীটিকেই সে জ্যোৎস্না উপভোগের ঘাঁটি স্থির করিল।

'তারপর, টাকা আদায় হলো? না বাক্যব্যয়ই সার?' সঞ্জীব বেদীর উপরে আসিবার পর প্রতিমা বেশ গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করিল।

'মিছিমিছি বাক্যব্যয় করা আমার অভ্যাস নয়।' সঞ্জীব সকৌতুকে কহিল। 'একেবারে পাঁচ হাজার! সত্যি, আমি এতটা আশা করিনি, প্রতিমা। এ শুধু তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে।'

'তবে কৃতজ্ঞ হ'তে চান বলুন!' প্রতিমা ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল। 'তা হোন্, ক্ষতি নেই, কিন্তু দয়া করে যেন মনে করবেন না, আপনার প্রচারিত অর্থনীতিতে আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি। মোটেই না। বরঞ্চ আমার একটা গভীর উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব নয়। একটা কূটনৈতিকচাল হিসেবে…'

'মস্ত কূটনীতিজ্ঞ হয়ে উঠচ, দেখা যাচ্ছে।' সঞ্জীব সকৌতুক কণ্ঠেই কহিল। 'আমার অবৈতনিক ইস্কুলে এসে ভর্তি হও, সব কূট অবিদ্যা দূর করে' দেব। চরকার ওপর আর তোমার বিন্দুমাত্র রাগ থাকবে না। কিন্তু এইবার বোধহয়…'

'আর বলতে হবে না। এইবার কি বোধ হচ্ছে, আমি সহজেই বলতে পারব। বোধ হচ্ছে, বহুক্ষণ আজ কাজে ফাঁকি দিয়েচেন, এইবার তাড়াতাড়ি না ফিরলে ক্ষতি হওয়ার…'

'খুব গণৎকার হয়ে উঠেচ।' সঞ্জীব কৃত্রিম-বিরক্তি-বিকৃত প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া সস্মিত মুখে কহিল, 'মোটেই আমি তা বলব না। বরঞ্চ বলব,প্রতিমা একটা গান শোনাও তো। সে-ই কবে তোমাদের কলকাতার বাড়িতে তোমার গান শুনতাম, তারপর প্রায় একটা যুগ কেটে গেছে…'

'থাক্, দয়া করে আর গান শুনে কাজ নেই।' প্রতিমা নিরুচ্ছ্বাসের কণ্ঠে কহিল। 'বরঞ্চ কুটির-শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা শুরু করুন, আমি অবহিত হয়ে শ্রবণ করি…'

সঞ্জীব প্রশ্রয়-মেশানো দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নায় স্নাত প্রতিমার দিকে চাহিল। প্রতিমার কথা বলার ভঙ্গিই এই। কিছুটা উদাসীন, কিছুটা বা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদে পূর্ণ।

'একবার তাকিয়ে দেখ, কি রকম রূপোর মতো জ্যোৎস্না উঠেচে।' সঞ্জীব আলাপের একটা উপযুক্ত বিষয় হাত্‌ড়াইয়া পাইবার চেষ্টায় কহিল। ইলেকট্রিকের কড়া আলোয় এমন জ্যোৎস্না বাঁচতে পারে না—তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিয়ে পালায়। তাই তো আমি বলি, প্রকৃতির অবিকৃত সৌন্দর্য্য ও উদার গাম্ভীর্য্য উপভোগ করতে হলে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে, সহজ ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজে বার করতে হবে। হানাহানি কাড়াকাড়ি, হৈ-হল্লা মানুষের প্রকৃত সুখের অন্তরায়। রুচিকে বিকৃত এবং অভাব-বোধকে অনাবশ্যক উদ্ধত না করে' তুললে মানুষ অতি সহজেই তৃপ্ত হতে পারে। এইজন্যই তো মহিমের প্রস্তাব আমার কাছে এতটা...'

'আবার শুরু করলেন তো!' প্রতিমা শঙ্কিত কণ্ঠে, সপ্রতিবাদে কহিল।

'প্রতিমা, এ না-বলে আমি পারিনে, কিছুতেই পারিনে।' সহসা সঞ্জীব গম্ভীর হইয়া উঠিল। 'এটা আমার সাধনা, এ আমার আদর্শ। আমি মানুষকে সুখী সন্তুষ্ট দেখতে চাই। কিন্তু সারা পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করা, সমগ্র মানব-জাতির উপকার করা আমার শক্তির বাইরে। তাই আমার ছোট গ্রামটাকে আমি বেছে নিয়েছি। এর সরল মানুষগুলির আমি উপকার করতে চাই, তাদের তৃপ্ত-আনন্দিত দেখতে চাই। তার আয়োজনেই আমার সকল শক্তি নিয়োগ করেচি। অল্পেই এরা তুষ্ট। কারখানার জীবন থেকে সুখ পাওয়া অসম্ভব। আমি তা নিজের চোখে দেখেচি। দেখেচি বলেই, সংঘাত, নোংরামি আর ঈর্ষ্যার আমদানি করে এদের জীবনে অনাবশ্যক একটা ভূমিকম্প সৃষ্টির আমি পক্ষপাতী নই।...এসো না, প্রতিমা, তুমি এসে এ-প্রচেষ্টায় আমার সঙ্গে দাঁড়াও। তোমার দাদাকে স্বমতে আনতে পারব বলে আর তো ভরসা হয় না। বিলিতি ইকনমিস্টদের থিয়োরি সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসে আছে।

আড়ম্বরের জন্ম, দুঃসাহসিক দুঃসাধ্য এবং জটিল কিছু করবার জন্ম পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তুমি এর উর্দ্ধে উঠতে পারবে। মেয়েরা কীর্ত্তির চেয়ে শান্তিকে মূল্যবান মনে করে। মহিমের বদলে না হয় তুমিই এসো, প্রতিমা। তুমিই এসো...'

প্রতিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিছু বলিল না। কিন্তু পরিহাসও করিতে পারিল না। সঞ্জীবের কথার সূত্র ধরিয়া সে সর্ব্বদাই পরিহাস করিয়া থাকে, কিন্তু উহার কথার সুর অকস্মাৎ এমন করুণ এবং আবেদনপূর্ণ মনে হইল যে, প্রতিমা ইহার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। সঞ্জীবের গ্রামোন্নয়নের এই প্রচেষ্টার প্রতি প্রতিমার আস্থা মহিমের চেয়েও কম। চিরকাল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হইয়া একেই তো ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর তাহার কাছে কাম্য মনে হয়, তারপর দেশ-বিদেশের শ্রম-শিল্পের উন্নতি ও এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্যের মান-বৃদ্ধির বিবরণ পাঠ করিয়া আর দশজন শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের মতো সেও বৃহদায়তন শ্রম-শিল্পে আস্থাসম্পন্ন। সঞ্জীবের প্রতি অনুরক্তির দরুণ তাহার সশ্রদ্ধ বিশ্বাসে সে আঘাত করে না বটে, কিন্তু অনুমোদনও যে করে না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ একটা অবকাশ রাখে নাই।

আটটার মধ্যেই কাজ শেষ করিয়া মহিম কাছারিবাড়ি হইতে ফিরিয়াছিল। ফিরিয়াই সোজা সে মায়ের ঘরে উপস্থিত হয়। মিল খোলার প্রস্তাবটা আগে হইতেই মাকে জানাইয়া তাহার একটা সম্মতি আদায় করিয়া রাখাই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতি সহজেই এই সম্মতি আদায় করা গেল। পুত্রের প্রস্তাবে কখনই তিনি কোনও আপত্তি তোলেন না। কিন্তু প্রতিদানে তিনিও একটি দাবি করিয়া বসিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সু এবং কু-যুক্তি আমদানি করিয়া মহিমকে অবিলম্বে পুত্রবধূ ঘরে আনিবার অনৌচিত্য প্রমাণ করিতে হইল।

প্রকাণ্ড জোড়া খাটের উপর সাদা ধবধবে বিছানা। এত বড় বিছানায় ব্রজময়ীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বহুকালের ব্যবস্থার তিনি পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই বিছানার এক কোণায় গায়ে শাদা শাল মুড়িয়া ব্রজময়ী বসিয়া আছেন। আব্দারে ছোট ছেলের মতো মহিম তাহার পাশে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। সে জানে, যেখানে যুক্তিতে কাজ হয় না, সেখানে আব্দারে ফললাভ হয়।

'বোনেব বিয়ে না দিয়ে যদি নিজে বিয়ে না করবি, তবে উদ্যোগ করে এবার বোনেরই বিয়ে দে না, বাবা।' ব্রজময়ী ধীরস্বরে কহিলেন। শান্ত, গম্ভীর, মর্য্যাদাপূর্ণ মুখ, মাথার চুল অর্দ্ধেক পাকিয়াছে; দীর্ঘ চোখ সোনাব ফ্রেমওয়ালা চশমায় মোড়া। উল্টো দিকের দেওয়ালে যেখানে স্বামীর বড়ো অয়েল-পেণ্টিংটা টাঙানো আছে, সেদিকে বাববার চাহিয়া তিনি যেন নিজ কর্ত্তব্য জানিযা লইবার চেষ্টা করেন। ইহা লইয়া ভাই-বোনে একটু হাসাহাসিও যে না কবে, এমন নয, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। স্বামী জীবিত থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া ব্রজময়ীব কোনও ইচ্ছা ছিল না; ইহা লইয়া প্রসন্নকুমারও কত ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে যাহাব পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরও তাহা অপরিবর্ত্তনীয় রহিল। স্বামী বলিতেন, 'ছেলেমেয়েরা আমাদের খেলার পুতুল নয়। ওদের আমরা পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু হুকুম করে যেন আমাদের নিজেদের অভিরুচি মতো চলতে বাধ্য না করি। আমাদের সন্তান হলেও ওবা স্বতন্ত্র।' ব্রজময়ী এই উপদেশ প্রতি অক্ষরে পালন করিযা থাকেন।

'প্রতিমার বিয়ে সম্বন্ধে আমি ভাবচি না, তা ভেবো না।' মহিম উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল। 'কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটায়, কি জানো মা, একটু জটিলতা, মানে একটু মুস্কিল আছে। ঠিক কতটা মুস্কিল তা...'

'কেন মহিম, এতে মুস্কিল কোথায়, বাবা?' ব্রজময়ী পুত্রের দিকে

চোখ তুলিয়া সামান্য বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন। 'রূপে গুণে এমন মেয়ে ক'টা পাওয়া যায়? এতটা সম্পত্তিই বা ক'জন মেয়ের ভাগ্যে জোটে? ওর বিয়ে দিতে মুস্কিলে পড়তে হবে কেন রে?'

'না মা,আমি তা বলছি নে,' মহিম তাড়াতাড়ি কন্যা-গর্ব্বিতা মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল। 'আমি অন্য কথা ভাবচি। মানে, তুমি হয় তো লক্ষ্য করেচ, কি বলে, প্রতিমা সঞ্জীবকে খুব পছন্দ করে। সঞ্জীব আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং চমৎকার ছেলে। ছোটবেলা থেকেই তো তুমি ওকে দেখে এসেচ। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাকে একটা অদ্ভুত বাতিকে পেয়ে বসেচে। এই বাতিকের দরুণ শুধু যে সে একটা ভদ্র চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেচে, তাই নয়, গাঁয়ে এসে এমন একটা কাজ নিয়ে পড়েছে যা মরুভূমির বালুতে জল ঢালার মতোই অর্থহীন। ওর কাজে চাষা-ভূষোর সামান্য উপকার যে কিছু না হয়, তা নয়; কিন্তু ওর নিজের কোনই লাভ হয় না। আমার আশঙ্কা হয়, একটা সাদাসিধে ভদ্র-জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট আয়ও ওর নেই। অবশ্য এতে খুব বেশি ভাবনার ছিল না। এতে আটকাতো না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক হলে তার সকল অভাব আমরা মিটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এখানে আবার সমস্যা। স্ত্রীর টাকায় সংসার চালাতে রাজি হবে, সঞ্জীব সে ধরণের ছেলে নয়, কিছুতেই তাকে রাজি করানো যাবে না...'

স্বামীর তৈল-চিত্রের দিকে চাহিয়া ব্রজময়ী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর যেন সে দিক হইতে বলসঞ্চয় করিয়াই কহিলেন, 'সঞ্জীবকে আমি পছন্দ করি। সে ভালো ছেলে। কিন্তু তা বলে তাকেই জামাই করতে হবে, তাকে না হলে চলবে না, এমন তো কথনই মনে করিনি, মহিম। একটু খোঁজ করলে কত বড় ঘরের কত কৃতী পাত্র ...'

'তুমি তো প্রতিমাকে জানো, মা।' মহিম কহিল। 'সে যাতে রাজি না হবে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও তাকে তাতে রাজি করাতে পারবে

না। এ জন্যেই তো এতো ভয়। সঞ্জীবের ওপরই যদি ওর ঝোঁকটা পড়ে থাকে—আমি অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু জানি না, কিন্তু এ যদি সত্যি হয়, তবে তার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা উচিতও হবে না, সহজও হবে না। এইসব কথা ভেবেই আমাদের এই প্রস্তাবিত কোম্পানীতে আসবার জন্য সঞ্জীবকে এত পেড়াপিড়ি করচি ' এলে ও যা চায় তাও হবে—দশ গাঁয়ের গরিবদের উপকার হবে, আর ঐ সঙ্গে ওর নিজেরও একটা ভদ্র আয়ের সংস্থান হবে। এতে যদি সঞ্জীব রাজি হয় তবে আমরাও প্রতিমার বিয়েতে মত দিতে পারি। মনের মিলই তো বড় মিল। তা ছাড়া, সঞ্জীব সত্যই উঁচু দরের মানুষ। যার হাতে প্রতিমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এমন মানুষ।···কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। সে বলে, কলের আমদানি করলে পাঁচ গাঁয়ের শান্তি ও সুখ নষ্ট হবে।···আমার এঞ্জিনীয়ার বন্ধু কেশব কাল দুপুরের আগেই এখানে এসে পৌঁচচ্ছে। কারখানার সব ব্যবস্থা পাকা করে' সে ফিরবে। অথচ আজও সঞ্জীবের মত করাতে পারলাম না। ওর বিশ্বাসটা জেদের পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে···'

এমন আড়ি পাতিয়া অন্যের কথা কি শোনা উচিত?—ব্রজময়ীর ঘরের দরজার বাহিরে কান পাতিয়া দাঁড়াইবার পর হইতেই প্রতিমার অপরাধী বিবেক প্রশ্ন করিতেছে। সামান্য কিছুক্ষণ আগে উচ্ছ্বসিত মুখে বাড়ির সমুখের অসংখ্য সিঁড়িগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া অতিক্রম করিয়া সে উপরে উঠিয়া আসে। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুদূর গ্রাম্যপথে একটা দূরত্ব-অস্পষ্ট মসি-মূর্ত্তিকে আবিষ্কার করিতে পারা ছাড়া, তার আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মায়ের ঘর হইতে সহসা তার নিজের নামটা শোনা গেল। ইহাতেই সে আকৃষ্ট হইয়া আগাইয়া আসে, কিন্তু চকিতে আলোচনার বিষয়বস্তুর

আভাস পাইয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়ে। মহিমের সব কথাই সে শুনিতে পাইয়াছে।

এদিকে ওদিকে দু-চারজন চাকর-দাসীকে আনাগোনা করিতে দেখিয়া আড়ি পাতার অপরাধ সম্বন্ধে সে সবিশেষ সচেতন হইল। আরও শুনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইচ্ছাকে সংযত করিতে হইল। পা টিপিয়া টিপিয়া, প্রায় মোহগ্রস্তের মতো প্রতিমা নিজের দীপ-নেবানো জ্যোৎস্না-স্পৃষ্ট ঘরে আসিয়া ঢুকিল। গায়ের প্রতিটি রক্তকণা যেন নাচানাচি শুরু করিয়াছে। মাদক-বিহ্বল পাখির মতো দুইবার পাক খাইয়া প্রতিমা নিজের বিছানার উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

ছয়

দুপুরের খাওয়ার আগেই কেশব আসিয়া পৌছিল। ড্রইং-রুমের আরামপ্রদ 'ডিভানে'র উপর হইতেই সিং-দরজার কাছে তূর্য্যধ্বনিরত কেশবের রেসিং-কারটা মহিমের নজরে পড়িয়াছিল। 'ঐ কেশব এসে পড়েছে। আয় প্রতিমা, তুই-ই তো হোস্টেস্,' বলিয়া সীবন-রত প্রতিমাকে ডাকিয়া সে অতিথির অভ্যর্থনার জন্য সামনের সিঁড়িগুলির দিকে আগাইয়া গেল।

চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া সজোরে হাত নাড়িয়া কেশব দূর হইতেই উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার এবং নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাইয়া আসিয়া মাত্র সিঁড়ির নিকট পৌছিবার পর সহসা সজোরে ব্রেক কষিয়া পলকে গাড়ি থামাইল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া নিচে নামিয়া পড়িল। কিন্তু সেইখানেই তার ছোটা থামিল না। 'কি পুরস্কার দেবেন, মহিমবাবু।' বলিতে বলিতে এক একবারে দুই দুই ধাপ করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সে উপরে ছুটিল। 'একেবারে করেক্‌ট্ টু দি ওয়চ বারোটায় পৌচে গেছি।'

'এসো, এসো।' মহিম খুসি-ভরা মুখে অভ্যর্থনা করিল।

কেশব উপরে পৌছিয়া প্রথমেই নিজের হাত ঘড়ি মিলাইয়া দেখিল। বেশ একটা তৃপ্তির ভাব তার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কহিল, 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় হিসেব রক্ষা করেচি। যদি অ্যাভারেজে চল্লিশ মাইল স্পীড্ রাখতে পারি, তবে দেড় ঘণ্টার মাম্‌লা, এই ক্যালকুলেশান করে' বেরিয়ে

পড়েছিলাম। অঙ্ক ঠিক মিলে গেছে। এর সম্মানে একটা বিরাট ভোজ চাই...’

খুব চটপটে উৎসাহী যুবক কেশব। লম্বায় খুব উঁচু নয়। কিন্তু প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্যে প্রায় টগবগ করিতেছে। ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, ঘাড় শক্ত, ঠোঁট দৃঢ় এবং হাতের কব্জা শক্তিশালী। বিলিতি টুইডের একটা ভালো ছাঁটের স্যুট পরণে, পায়ে পুরু সোল-ওয়ালা স্যুয়েডেব জুতো, গলায় টাই নাই। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টেক্সটাইল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিগ্রি লইয়া সে ল্যাঙ্কাসায়ারের একাধিক কাপড-কলে শিক্ষানবিশী এবং চাকরি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার সামান্য কিছুদিন আগে সে দেশে ফিরিয়া আসে। বম্বে এবং আমেদাবাদের বিভিন্ন মিলে কাজ করে; কিন্তু চাকরি ভাল লাগে না। ওর ইচ্ছা, নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তার নিজস্ব আইডিয়াগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা না থাকে। কিন্তু কেশবের সবচেয়ে বড়ো অভাব ক্যাপিটেলের। পাগলের মতো সে যখন ক্যাপিটেল অন্বেষণে রত ছিল, তখন একদিন হঠাৎ মহিমের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। মহিমও তখন বড বড় প্ল্যান ফাঁদিয়া দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছে। কেশব স্কুল এবং কলেজ জীবনে তাহার পরিচিত ছিল। এখন এই যোগাযোগই দশার্ণপুরে কাপড়ের কল স্থাপনের এই পরিকল্পনাকে এমন জরুরি ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

‘চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটে এসে বেচারি রীতিমত ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছে। একে কি খাওয়াবি বল, প্রতিমা?’ মহিম প্রতিমাকে কহিল। ‘তোমার সঙ্গে প্রতিমার আলাপ হয়নি বুঝি, কেশব?’

‘নমস্কার, প্রতিমা দেবী। না হয়নি।’ পরিচয়-দানের অপেক্ষা না করিয়াই কেশব স-নমস্কারে কহিল। ‘একাধিক দিন আপনাদের কলকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু তা হলে কি হয়,

মহিমবাবু আমাকে পরিচিত করিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত মনে করেন নি। এঞ্জিনীয়ারদের ঐ অসুবিধে। ভদ্রলোকেরা তাদের কুলির সর্দ্দার ভাবতেই অভ্যস্ত।' বলিয়া সে সজোরে হাসিয়া উঠিল।

'চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন।' প্রতিমা শান্তভাবে কহিল। 'খাবার তৈরি।'

'বাঃ, সুন্দর বাগানটা তো!' কেশব বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিয়া কহিল। 'ওদিকের পুকুরের সঙ্গে এদিকের খালটা ব্যালেন্স করা হয়েচে। ফটক দিয়ে দালানের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আঙুরি-বাগের পথে তাজমহলের দিকে এগিয়ে আসচি। স্ট্রাক্‌চারটা মুঘল-পদ্ধতি অনুসারে পারফেক্ট, শুধু মিনারগুলি না থাকাতে প্রোপোর্শনের দিক থেকে·· কিন্তু আমি সিভিল এঞ্জিনীয়ার নই, অনধিকার-চর্চ্চা করব না। লন্‌গুলি দেখচি রীতিমত টেনিস-কোর্ট করবার উপযুক্ত। থাকলে পেটানো যেত। আর বাঁধানো পুকুর দেখেই তো আমার সাঁতরাতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনারা সাঁতরান না, প্রতিমা দেবী?'

'না,' প্রতিমা কহিল। 'কিন্তু কেউ নিজ দায়িত্বে সাঁতরাতে চাইলে আপত্তি করিনে।'

'ওবে বাবা, ম্যালেরিয়ার কথাটা তো ভুলেই গিছলাম!' কেশব সাতঙ্কে কহিল। 'অনায়াসেই একদিকে একটা সুইমিং-পুল করে নেওয়া যায়। জল পাম্প করে' আনা আর নেওয়ার ব্যবস্থা করলে অ্যানোফিলিস্ বাছাধনদের বসবাসে কিছু অসুবিধে হবে বটে, কিন্তু সাঁতার কেটে সন্ধ্যাবেলাটা অনায়াসে আনন্দে কাটাতে পারবেন। সাঁতারের মতো একসারসাইজ আর নেই, ঘোড়ায় চড়া ছাড়া···'

'তোমার কথার ঘোড়াটার রাশ টেনে এইবার বরঞ্চ ভেতরে চলো।' মহিম বচনবিলাসী কেশবের উৎসাহে বাধা দিয়া কহিল।

'চলুন। আমি রেডি। এমন কি আমার ব্লু-প্রিণ্ট পর্য্যন্ত রেডি।'

কেশব প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল। 'দেখবেন চলুন। গত সারা সপ্তাহটা একটানা খেটেচি। কারখানার চিম্‌নি থেকে শুরু করে' কুলি লাইন পর্য্যন্ত সমস্ত স্ট্রাক্‌চারের নক্সা প্রস্তুত। জমির প্ল্যানটা খুব কাজে লেগেছে। কলকব্জার লিস্ট্, কোথায় কোথায় তাদের বসানো হবে, কি কি সেফ্‌টি ব্যবস্থা থাকবে, কি রকম সাক্‌শন ব্যবহার করব, ম্যানেজারের অফিস কি রকম হবে, কোনও খুঁটিনাটিই বাদ দেই নি। হুজুরিমলের সঙ্গে আমি কথাও বলে এসেচি। আরও হাজার পঞ্চাশেক বাড়িয়ে দিলেই সে মেশিনারিগুলি বেচতে রাজি হয়ে যাবে। তাছাড়া, মেশিনারি আমদানির পারমিট্‌ও আমরা পেয়ে যাব। দিল্লী থেকে যশোদাবাবুর চিঠি দিন তিনেক আগেই পেয়েচি। মানে, সব ঠিক আছে। এইবার যদি আপনি সোনার কাঠি আর রূপার কাঠি ছুঁইয়ে দেন, তবেই রাজকন্যা জেগে উঠতে পারে...'

'তোমার কল্পনার দৌড় আছে বটে!' মহিম সকৌতুকে কহিল। 'সঞ্জীব হলে কারখানাকে কিছুতেই রাজকন্যার সঙ্গে তুলনা করতে পারত না, কি বলিস প্রতিমা? সঞ্জীবকে বোধহয় তুমি ভুলে গেছ? আমাদের সঙ্গে পড়ত। ডেপুটিগিরি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে কতগুলি কো-অপারেটিভ্ খুলে বসেচে। দেখ, তোমার উৎসাহ দিয়ে কুটির-শিল্পের বদলে তাকে যদি শ্রমশিল্পের দলে টানতে পার। কিন্তু তার আগে এইবার ভেতরে যাওয়া যাক্...'

'এক মিনিট। ফোলিও-ব্যাগটা নিয়ে আসচি।' বলিয়া পলকে কেশব হন্‌হন্ করিয়া নিচে গাড়ির দিকে ছুটিল।

সন্ধ্যায় কেশবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিবে বলিয়া সঞ্জীব গত সন্ধ্যায়ই মহিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে যাওয়া সম্ভব হইল না। সমবায় বিক্রয়সমিতির এক জরুরি বৈঠক ডাকা

হইয়াছে। কখন ইহার কাজ শেষ হয়, কিছুই ঠিক নাই। এই খবরটি একটা চিঠি লিখিয়া সন্ধ্যার আগেই সে মহিমকে জানাইয়া দিয়াছে।

কাজটা সত্যই জরুরি। ভালো দামে শস্য বেচিতে পারিয়া সমিতির যেসব সভ্যেরা বিক্রয়-সমিতির মারফৎ ছাড়া ধান বেচিবার কথা ভাবিত না, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের বছরের পর চালের বাজার লক্ষ্য করিয়া তাহারাই এখন সমিতির মারফৎ শস্য বেচিতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য চাল মজুত করিয়া রাখিবে এবং সময় বুঝিয়া কোপ্ মারিবে। বাংলা-সরকারের শস্য-সংগ্রহ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

স্বার্থপরতা মানুষের কি রকম একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। সঞ্জীব ইহাদের যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, তাহাদের সহযোগিতার উপর সারা বাংলাদেশের লোকের প্রাণ নির্ভর করিতেছে, ততই তাহারা নিজেদের লোকসানের কথা তুলিয়া সমস্যাটা ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে। সজনেহাটার বাজারের আড়ত-দারদের অতি-মুনাফা লাভের প্রবৃত্তিকে যে তাহারা কিছুকাল আগেও কড়া ভাষায় নিন্দা করিয়াছে, নিজেদের লাভের সম্ভাবনায় সে কথাও আর তাহাদের মনে পড়িল না।

মহিমদের বাড়ি হইতে দূরে থাকিবার আরও একটি কারণ ছিল। গত রাত্রে চন্দ্রালোকিত বাগানে প্রতিমার আচার-আচরণে তাহার মনের কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে সঞ্জীব রীতিমত আশঙ্কিত বোধ করে। প্রতিমা কি তাহার স্বীকৃতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে? বিনিদ্র শয্যায় শুইয়া খোলা জানালা দিয়া কালো কালো সান্ত্রীর মতো খেজুর গাছগুলির দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কাল রাতেই সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিমা যদি সঞ্জীবের আদর্শে আস্থাবান হইত, এই আদর্শের জন্য সঞ্জীবের পাশে দাঁড়াইয়া দারিদ্র্যে

অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত, তবে ভিন্ন কথা ছিল। দারিদ্র্যকে সঞ্জীব সুখের অন্তরায় বলিয়া মনে করে না। কিন্তু প্রতিমা তাহার আদর্শে বিশ্বাস করে না, দারিদ্র্যকে সে শুধু ভয় নয়, ঘৃণা করে। উহাকে লইয়া সঞ্জীব কি করিবে ?

বিক্রয়-সমিতির বৈঠক ভাঙিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। প্রথম কিস্তি হিসাবে সভ্যেরা কিছু পরিমাণ চাল এবং ধান বিক্রয়-সমিতির মারফৎ বেচিতে রাজি হইয়াছে। দেশজোড়া চাউল-দুর্ভিক্ষের দিনে চাউল মজুত করিয়া রাখা যে মানুষকে উপোস করাইয়া মারিবার মতো পাপকার্য্য, তাহা চাউলের বাজার-মূল্য সম্বন্ধে সচেতন চাষীদের বুঝাইতে কম বেগ পাইতে হয় নাই। আংশিক ভাবে কৃতকার্য্য হইয়া সঞ্জীব খুব হাল্কা বোধ করিল।

রাত বেশি হয় নাই। ইচ্ছা করিলে এখনও একবার জমিদারবাড়ি ঘুরিয়া আসা যাইত। কিন্তু সঞ্জীব সে চেষ্টা করিল না, নির্জ্জন গ্রাম্য রাস্তা ধরিয়া গ্রামের ভিতর দিকে আগাইয়া গেল।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় সারাটা গ্রাম যেন রূপালি স্বপ্ন দেখিতেছে। বাঁশ ঝাড়, শ্যাওড়া-বন, খড়ের গাদা, শণ-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর সব কিছুই ছবির মতো সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পরাণ মুদির মুদিখানা পার হইয়া, কালু শেখের গোরুর গাড়ির আড়গাড়া ছাড়াইয়া, শীতলা-মন্দির বাঁয়ে রাখিয়া সঞ্জীব সুষুপ্ত গ্রামের ভিতর দিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটিয়া চলিল, যেন রীতিমত একটা বিলাসিতা উপভোগ করিতেছে। অখণ্ড স্তব্ধতায় পৃথিবী ও আকাশের একাত্মতা স্থাপিত হইয়াছে ; এই জগতে ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, অভিযোগ নাই, ঈর্ষ্যা নাই।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে সারা গ্রামের এমন ঘুমাইয়া পড়াটা এক সময় সঞ্জীবের কাছে বড়ই করুণ মনে হইত। জীবন হইতে গ্রামবাসীরা

অনাবশ্যক অনেকগুলি ঘণ্টা বাদ দিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রতিকারের কথা ভাবিতে গিয়া লেনিনের মতো সে-ও স্বপ্ন দেখিত, দেশের প্রত্যেকটা গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বালাইয়া দিতে হইবে; জীবনের মেয়াদ বাড়াইতে হইবে। তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল, জীবনে শান্তি লাভই সবচেয়ে বড় আদর্শ বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিল, ততই যেন গ্রামের এই বিশ্রাম এবং নৈঃশব্দ্য, এই প্রশান্তি ও বৈরাগ্য অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তালবাগানের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির চুম্‌কি-আঁটা পলাস-ডাঙার মাঠটা দেখা যাইতেছে। এই জায়গাটায়ই মহিম তাহাব প্রস্তাবিত কাপড-কল বসাইতে চায়। উঁচু জমি, দীর্ঘে ও প্রস্থে সুবিধাজনক। ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ স্থাপন সহজ। সঞ্জীব যেন কল্পনানেত্রে পলাসডাঙাব মাঠেব আসন্ন পরিবর্ত্তন সভয়ে লক্ষ্য কখিতে লাগিল।

পলাসডাঙার মাঠে গ্রামেব মেলা বসে, পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে ঘোড-দৌড হয, গ্রামের ছোট ছেলেবা সদলে আসিয়া নিরুপদ্রবে ঘুড়ি ওডায়। যেটা গ্রামেব উৎসব-স্থল, অচিবেই হয়তো একটা ভযঙ্কর চেহারাব কাবখানা তাহাকে উদবস্থ কবিয়া ফেলিবে। এই নিস্তব্ধতা, এই ঝোপ-জঙ্গল, এই শণ-ছাওয়া কুটিরগুলির সঙ্গে সঞ্জীব কিছুতেই একটা বিরাট কালো দুর্দর্শন কাবখানাব সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছে না; এই আবেষ্টনে একটা গর্জ্জমান মিল নিতান্তই বেখাপ্পা ব্যাপার। অজানা দেশ হইতে এ যেন একটা দৈত্যের হানা দেওয়াব মতো।

সহসা বাঁশঝাডের ওদিকের কুঁড়ে ঘরগুলি হইতে বহুজনের মিলিত চাপা-কান্নার মতো একটা শব্দ শুনিয়া সঞ্জীব কান খাড়া করিল। আর্ত্তনাদ এতই সুস্পষ্ট যে, অস্বীকার কবিবার উপায় নাই। উদ্ধব মণ্ডলের সঙ্গে আজ ভোরেও সঞ্জীবের দেখা হইয়াছে, এমন কোনও বিপদের কথা তো

শোনে নাই। তবে সহসা এতজনে মিলিয়া কাঁদিবে কেন? রাস্তা হইতে নামিয়া সঞ্জীব বাঁশঝাড়ের দিকে আগাইয়া গেল।

উদ্ধব জাতে কৈবর্ত্ত এবং ব্যবসায়ে চাষী। নিজস্ব কিছু খামার আছে, তা ছাড়া বর্গায়ও কিছু কিছু জমি চষিয়া থাকে। তার বাড়ির মেয়ে এবং ছেলেপেলেরা ভারি সুন্দর বেতের বাক্স ও ঝুড়ি বানাইতে পারে। এই জিনিষগুলি গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের বিক্রয়-সমিতির মারফৎ বিক্রি করিয়া উদ্ধব বেশ দু পয়সা কামাইয়া থাকে।

ঘরের দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া অপর ভিটার ঘরের নিক্ষিপ্ত ছায়ায অস্পষ্ট হইয়া উদ্ধব গম্ভীর ভাবে হুঁকো টানিতেছিল, সঞ্জীবকে চিনিতে পারিয়া হুঁকোটা একপাশে কাৎ করিযা রাখিযা তাড়াতাড়ি উঠিযা দাঁড়াইল এবং হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'ব্যাপার কি উদ্ধব? হয়েছে কি?' সঞ্জীব কাছে আগাইয়া আসিযা উদ্বেগেব স্বরে প্রশ্ন করিল।

'সব্বনাশ হয়েছে দা'ঠাকুর, সব্বনাশ হয়েচে।' উদ্ধব ফোঁপাইযা উঠিল। 'ব্যাটা আমার সব্বনাশ করে অ্যায়েচে। তখুনি আমি পই পই করে কত বারণ করলাম, ওরে যাস্‌নি, ওবে যাস্‌নি। চাষাব ছেলে, কি কাজ তোর ওতে? কিন্তু বুড়োর কথা কে শোনে। ছেলে সেয়ানে হযে উঠেচে, বুড়ো হাব্‌ড়ার কথায় তারা কান দেবে কেনে? নাও, এবাব সব্বনাশটি হলো তো' ল্যায্যের চেয়ে বেশি দৌড়তে গিয়ে একবাবে জন্মের বলে বসে পড়লি! ঘোড়ার মতো তেজী ছেলেটা, দা'ঠাকুর। সেই ঘোড়া খোঁড়া হয়ে গেল···'

ঘরের ভিতরকার ক্রন্দনপরায়ণগণ হয়তো ক্লান্তিবশতই বিলাপে ঢিলা দিয়াছিল, এইবার বাহির হইতে সমর্থন পাইয়া আবার কান্নায় জোর দিল। এই গৃহব্যাপী বিলাপধ্বনির মধ্যে বিপদের কারণ জানাই সঞ্জীবেব পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

উদ্ধবের বড় ছেলে মহীন্দর বা মহেন্দ্র মাত্র কয়মাস আগে বাপের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হাওড়ার দিকের কোন্ একটা পাটকলে কাজ নেয়। ইহা লইয়া উদ্ধব সঞ্জীবের কাছে বহু আক্ষেপ জানাইয়াছে, সামান্য টাকার লোভে নিজের ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে বিভুঁয়ে পড়িয়া থাকিবার সার্থকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। আজ সেই অবাধ্য ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে, কিন্তু দুই পায়ে হাঁটিয়া ফিরিতে পারে নাই! একটা আস্ত ঠ্যাং কলের মুখে শুল্ক গুণিয়া দিয়া হাসপাতালে সে এক মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, এবং আজ সন্ধ্যার পর দুইজন সহকর্ম্মীর কাঁধে ভর দিয়া নিজের বাড়িতে আসিয়াছে।

'এখন উপায় হবে কি, দা'ঠাকুর?' উদ্ধব ক্রন্দন সংযত করিয়া সোদ্বেগে প্রশ্ন করিল। 'একটা আস্ত ঠ্যাং খুইয়ে এসে এখন যে হাল চষে খাবে, তারই বা উপায় কি? এ কি সব্বনাশ!'

'সে হয়ে যাবে, উদ্ধব।' সঞ্জীব গম্ভীর ক্লিষ্ট মুখে কহিল। 'সঙ্ঘটা তো আছেই। আর কিছু না হোক ওখানেই কোন একটা কাজে লেগে যেতে পারবে। ও তো তোমাদেরই জায়গা। এ নিয়ে ভাবনা করো না। কিন্তু চলো, ভেতরে গিয়ে ওকে একবার দেখে আসি। মেয়েদের না হয় একটু সরতে বলো...'

'এ তুমি কি বলচ, দা'ঠাকুর!' উদ্ধব সচকিত হইয়া কহিল। 'থাকলই বা মেয়েমানুষেরা। চলো, দা'ঠাকুর, ওর মাথায় একটু পায়ের ধূলো দাও।...ও মহীন্দরের মা, আর কাঁদিস নি, দা'ঠাকুর অ্যায়েচেন, আর কাঁদিস নি।' বলিয়া আবার নিজেই সে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্বল্পালোকিত ঘরে মহেন্দ্রের তক্তপোষের ধারে সঞ্জীব কতক্ষণ নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মানে ভিতরের লোকেরা বিলাপ বন্ধ করিয়াছে, শুধু পুত্রের শিয়রের পাশে দীর্ঘ ঘোমটা-টানা মহেন্দ্রের

প্রৌঢ়া মা, এবং ঘরের সুদূর প্রান্তে বেড়ার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার বালিকা স্ত্রী তখনও রুদ্ধ কান্নায় বারবার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

কাঁথাটার এক দিক তোলা মাত্র আইডোফর্মের ঝাঁজালো গন্ধ বহু-ফলাবিশিষ্ট ছুরির মতো ছুটিয়া বাহির হইল। সঞ্জীব বেদনার্ত্তমুখে মহেন্দ্রের পায়ের উপর ঝুঁকিয়া তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কাটা পা-টা লক্ষ্য করিতে করিতে শিহরিয়া উঠিল।

ডান পায়ের হাঁটুর উপরও পাঁচ-সাত আঙ্গুল পর্য্যন্ত বাদ পড়িয়াছে। যেন একটা বেয়াড়া দুষ্ট ছেলে খেয়াল বশে একটা আস্ত পুতুলের ঠ্যাং টানিয়া ছিঁড়িয়া সেটাকে বিকল করিয়া ছাড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি পায়ের উপর কাঁথাটা আবার চাপা দিয়া সঞ্জীব মহেন্দ্রের পাংশু মুখের উপর দৃস্ট ন্যস্ত করিল। একটা ভারি হাতুড়ি পিটাইয়া মুখটাকে যেন থেৎলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এই অদৃশ্য হাতুড়ির আঘাতের আশঙ্কাই যেন এখনও পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের মাংসপেশীগুলি অবলীলাক্রমে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইতেছে। কিন্তু মাংসপেশীর এই আক্ষেপ না থাকিলে রক্ত-ক্ষরণ-পাণ্ডুর এই মুখটাকে মড়ার মুখ হইতে তফাৎ করা যাইত না।

অকস্মাৎ পাঁচ পাঁচটা মিল-মজুরের মরণ-বিকৃত মুখ যেন স্মৃতির তলা হইতে সঞ্জীবের মনশ্চক্ষে লাফাইয়া আসিয়া হাজির হইল। কারখানার কালো চিম্‌নি, ধর্ম্মঘটকারীদের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি, মিলিত চিৎকার ও হুঙ্কার, 'ফায়ারিং-এর আদেশ দিন, স্যার, আমরা কি পড়ে পড়ে মার খাব?'...গ্রুম, গ্রুম, গ্রুম, পাঁচটা লোক মাটির উপর কাৎ হইয়া পড়ে, সারাটা আকাশকে মথিত করিয়া গগনভেদী চিৎকারে...

ঘুমন্ত মহেন্দ্রের কপালটা একবার তাড়াতাড়ি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে স্পর্শ করিয়া সঞ্জীব বিভীষিকাগ্রস্তের মতো ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

সাত

গত কাল সারা দুপুর ও সন্ধ্যা কেশব মহিমের সাথে কারখানার প্ল্যান লইয়া আলোচনা করিয়াছে। বিকালের দিকে মহিমের সঙ্গে গিয়া পলাসডাঙার মাঠটাও সে দেখিয়া আসে। মাত্র নক্সায় যা দেখিয়াছিল, তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। ইহা ছাড়া গত দুই দিনে কেশব আর এক পাও বাহির হয় নাই। দিনে পনেরো ঘণ্টা একটানা কাজ করিয়া গেছে। আশ্চর্য্য কাজ-পাগ্‌লা লোক কেশব। কাজ পাইলে আর কিছু চায় না, উহা লইয়াই মাতিয়া থাকিতে পারে, খাওয়া জ্ঞান থাকে না, নাওয়া জ্ঞান থাকে না।

আজও দুপুরের খাওয়ার পর গল্পগুজবে অযথা সময় নষ্ট না করিয়া সে মহিমের লাইব্রেরি-ঘরে চলিয়া আসিল। এটাই এখন তার কাজের ঘর। একটা মস্ত জানালার ধারে গোটা দুই উঁচু টেবিল জড়ো করিয়া সে ড্রইংয়ের জায়গা করিয়া লইয়াছে। ড্রাফ্‌টিংয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তার সঙ্গেই ছিল; ইহাদের সহায়তায় সে পুরানো ড্রইংয়ের সংস্কার ও নতুন নক্সা আঁকায় মনোযোগ দিয়াছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া গেল। যন্ত্রের মতোই কেশবের একাগ্রতা। সমুখে মেলা নীল এবং শাদা কাগজে বহু রহস্যজনক রেখা আত্মপ্রকাশ করিল।

ইতিপূর্ব্বে রামু বেয়ারা তাহাকে বার তিনেক চায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গেছে। রুল্‌ ও সেট্‌স্কোয়ারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রতিবারই সে 'হাঁ হাঁ' করিয়া চায়ের প্রতি সম্মান জানাইয়াছে, কিন্তু পরের মূহূর্ত্তে সে কথা আর তার মনে থাকে নাই।

চায়ের টেবিলে বহুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করিবার পর মহিম কহিল, 'একবার দেখে আয়, প্রতিমা, কি হলো। এক আচ্ছা কাজ-পাগ্‌লাকে নিয়ে পড়া গেছে। গত দুদিনে, এক রাতে ঘুমানো ছাড়া, বোধ হয় দুইঘণ্টাও বিশ্রাম করেনি…'

প্রতিমা কোনও মন্তব্য না করিয়া উঠিয়া গেল। প্রতিমা হোস্টেস্; অতিথিদের সকল পাগলামি তাকে সহ্য করিতে হইবে। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া সে কেশবের টেবিলের দিকে আগাইয়া গেল। কেশবের কানে তখন বোধহয় ঢাকের শব্দও প্রবেশ করিত না, প্রতিমার স্যাণ্ডালের দুর্ব্বল শব্দ এবং তাহার চুড়িবালার ততোধিক ক্ষীণ নিক্কণ সে শুনিবে কেন। কাজের মধ্যে সে ডুবিয়া আছে।

ব্লু-প্রিণ্টের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া কেশবের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া প্রতিমা দুই সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সহসা একটু জোরেই কহিল, 'চা ঠাণ্ডা হচ্চে। এবার আসুন।'

এইবার কেশব চম্‌কাইয়া ফিরিল। ডান হাতে পেন্সিল ও বাঁ হাতে গাটাপার্চার সেট্‌স্কোয়ার আত্মরক্ষার দুই প্রহরণের মতো অবলীলাক্রমে উদ্যত হইল। কিন্তু হিংসাত্মক আচরণের কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া সে স্মিত-মুখে সবিস্ময়ে কহিল, 'আরে, প্রতিমাদেবী, আপনি! কি আদেশ করবেন, করুন। আমি প্রায় শেষ করে' এনেছি! মহিমবাবুর সাজেশ্‌শানগুলি সত্যই খুব মূল্যবান ছিল; তাই ভাবলাম, অযথা বিলম্ব না করে ব্লু-প্রিণ্টে সেগুলি ধরে ফেলি।…এইবার বোধহয় আপনাকে সহজেই বোঝাতে পারব এতে কতটা সুবিধে হলো, কতটা খরচ বাঁচলো, এবং নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে আগের প্ল্যানের উপর কতটা উন্নতি করা হলো…'

'কিন্তু তার অনেক আগেই,' প্রতিমা গম্ভীর ভাবেই কহিল, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওঃ, তাই নাকি! চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে বুঝি!' কেশব যেন

চম্‌কাইয়া উঠিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল। 'কিছু টের পাইনি তো! বড়ই দুঃখিত। এই আমি বন্ধ করচি।...এই, এই দুটো টান মাত্র... ও কি, চলে যাচ্ছেন। অসন্তুষ্ট হলেন না তো? এটুকু তবে এখন থাক। সামান্য কাজ, চায়ের পরেই করব এখন। চলুন, চা-টাই আগে সেরে আসা যাক্‌।...আপনি শুনেচি খুব ভালো গাইতে পারেন! আজ শোনাবেন কি? গানের অবিশ্যি আমি বিশেষ কিছু বুঝিনে, কিন্তু আমাদের মতো কাটখোট্টা লোকের জন্যই গানের প্রয়োজন। খাটিয়ে লোকের ক্লান্তি-বিনোদনের কাজে আর্টকে লাগালে তবেই ললিতকলার সার্থকতা আমরা বুঝতে পারি...'

সন্ধ্যার পর সঞ্জীব আসিল। তর্ক করিবে না বলিয়াই সে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। তাহার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সংকল্প যখন স্থির আছে এবং তাহা বদ্‌লানো যখন সম্ভব নয়, তখন অনাবশ্যক তর্ক করার কোনও অর্থ হয় না। কেশবের বক্তৃতা সে অনেকক্ষণ ধরিয়াই শুনিল, কোনও মতামতই প্রকাশ করিল না। কেশব তাহার এই মৌনকে নিজের যুক্তির সাফল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া আরও উৎসাহিত বোধ করিল এবং আরও দীপ্ত ভাষায় প্রস্তাবিত কারখানার গুণাগুণ এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। দুই নিস্তব্ধ বন্ধুর দিকে তাকাইয়া সে কহিতে লাগিল: 'বাংলা-দেশের এ-অঞ্চলে এ-শ্রেণীর নিখুঁত কারখানার পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বে আর কেউ করেনি, এ কথা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি। ভেণ্টিলেশান, সাক্‌শন্‌, ফ্লোর্‌ স্পেস, কম্যুনিকেশন, চিম্‌নি, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় যা সব ব্যবস্থা আমাদের ব্লু-প্রিণ্টে করা হয়েচে, পৃথিবীর যে কোনও জায়গার উন্নত কারখানার সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে। প্রত্যেকটি মেসিনারি হবে আধুনিকতম সুবিধা-সংযুক্ত। কোনও মান্ধাতা আমলের উৎপাদন-পদ্ধতি এখানে স্থান পাবে না। এতে ক'রে শতকরা

পঁচিশ ভাগ কম খরচে কারখানা চল্‌তে পারবে। এ অঞ্চলে লেবার যেমন শস্তা পাওয়া যাবে আশা করচি, তাতে কস্ট্‌ অব্‌ প্রোডাক্‌শন্‌...'

সঞ্জীব এইখানে একবার বক্তার দিকে চোখ উঠাইয়া চাহিল, কিন্তু পূর্ব্বের মতোই সে নিশ্চুপ রহিল, কোনও উচ্চবাচ্য করিল না।

কেশব আরও বক্তৃতা করিল; কুলি-বস্তিগুলি কি রকমের হইবে, মজুরদের ছেলেপিলেদের জন্য একটা ইস্কুল করিবার কি পরিকল্পনা আছে, হাসপাতাল কোথায় এবং কবে প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সবই কেশব সগর্ব্বে জানাইয়া দিল। ভবিষ্যতে মজুরদের আরও কি কি সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, তারও ফিরিস্তি সে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। কারখানা স্থাপনের ফলে দশার্ণপুরের এবং আশেপাশের আরও দশ-বিশটা গ্রামের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কি কি অর্থনৈতিক সুবিধা হইবে, স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ আওড়াইয়া সে তাহা সপ্রমাণ করিল।

মহিম বারবার বন্ধু সঞ্জীবের দিকে চাহিয়া তাহার মুখে অনুমোদনের চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। মজুর-কল্যাণ ব্যবস্থা এবং গ্রামবাসীর আর্থিক উন্নতির হিসাব সম্বলিত বিশদ বর্ণনা শুনিয়া সঞ্জীব অন্তত কিছুটা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারিবে না, ইহাই সে আশা কবিতেছিল। সঞ্জীবকে নিশ্চুপ দেখিয়া সম্ভবত তাহার অনুমোদনের পথ মুক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সে কহিল, 'তবেই দেখ, গাঁয়ের যে সব লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুই সব চেয়ে বড়ো করে' দেখিস, আমাদের এই প্রজেক্টে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েচে কি না। প্ল্যান তৈরির সময় এদিকে কেশবকে আমি বিশেষ হুঁসিয়ার হ'তে বলেছিলাম। কাজ চালু হওয়ার পর মজুর-কল্যাণের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা যাতে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হতে পারে, কেশব তার দায়িত্ব নিয়েচে। মজুরদের বস্‌তিগুলি...'

'আমাকে ছাড়াই তোদের কাজ আরম্ভ করতে হবে, মহিম।' অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিতভাবে সঞ্জীব কহিল। 'ইচ্ছে করে' কলেরার জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়ার পর যদি মহামারী রোধের জন্য একদল শুশ্রূষাকারী পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তা যেমন অর্থহীন, বিপদ ডেকে এনে তারপর 'ওয়েলফেয়ার' ব্যবস্থা করাও ঠিক তেমনি। এ ধরণের সদিচ্ছার কোনও মানে হয় না…'

'আপনি অবাক করে' দিচ্ছেন, মশায়!' কেশব চোখের দৃষ্টিতে জগতের সকল বিস্ময় কেন্দ্রীভূত করিল। 'এ-ও আমাকে একজন শিক্ষিত লোকের মত বলে বিশ্বেস করতে হবে? আপনি কি চান, শুনি? গোরুর গাড়ির যুগে ফিরে যেতে চান? এফিশিয়েন্সির কি কিছু মূল্য নেই? হাতে যে তাঁত চালান হয়, মিলের বৈদ্যুতিক তাঁত তার দশগুণ মাল উৎপাদন করতে পারে। হাতে মাকু চালিয়ে আপনি কত শস্তায় কাপড় ছাড়তে পারেন শুনি? কারখানায় তৈরি কাপড়ের 'ফিনিশই' বা কোথায় পাবেন?…পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। তারা এত ধনী, এত প্রস্‌পারাস কি ক'রে হলো? তাদের দেশের সামান্য লোকের জীবনযাত্রার স্ট্যাণ্ডার্ডও এতটা উঁচু কেন? গরিবের ঘরেও এতো হাজার রকম 'অ্যামেনিটিজ' আনা সম্ভব হলো কি করে? এ সমস্তেরই মূলে হচ্চে, মেশিন, কারখানা, লার্জ-স্কেল্ প্রোডাক্‌শন। ভেবে দেখুন, মেশিন মানুষকে কত কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েচে। যেখানে তাকে প্রতিটা মাংসপেশী নিষ্পেষিত ক'রে, গায়ের হাড় চূর্ণ করে', মুখে রক্ত তুলে কাজ আদায় করতে হতো, মেশিনের আমদানির পর মাত্র একটা বোতাম টিপলেই তা সুসম্পন্ন হয়। মানুষের এত বড় উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে আপনাদের আপত্তি হাস্যকর গোঁড়ামি ছাড়া আর কি? প্রগতির ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে…'

'রাজি হ, সঞ্জীব, রাজি হ,' মহিম প্রায় অনুনয়ের সুরে কহিল। 'আয়, আমরা ক'জনে মিলে দেশের এবং দশের উপকারের জন্য এ

প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলি। তুই কি আমার উদ্দেশ্যের সততায় বিশ্বেস করিস নে? আমার মনের সকল কথাই তো তুই জানিস। নিজের স্বার্থ-সাধন আমার উদ্দেশ্য নয়…'

সঞ্জীব একবার চোখ উঠাইয়া চাহিল, এবং যেন একমাত্র মহিমের উদ্দেশ্যেই কহিতেছে এমনি ভাবে ঘনিষ্ঠতার অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'তোর উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই। নইলে এ নিয়ে আমি আলোচনাই করতাম না। কিন্তু কারখানার দৈত্য একবার জন্মলাভ করলে কারুর কথা মেনেই আর সে চলে না। সে স্বেচ্ছাচারী। তার নিজের শক্তির দাপটে সকল শুভ ইচ্ছাকে সে গলা টিপে শেষ করে দেয়। শুঁড়ির দোকান আসে, বারবনিতা আসে। গার্হস্থ্য-জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। অতি-উৎপাদনের পর আসে মন্দা; শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হয়, দুর্দ্দশা আসে। মালিকের লোভের সঙ্গে মজুরের স্বার্থের সংঘাত বাঁধে। শুরু হয় ধর্ম্মঘট, শুরু হয় লক্-আউট্। বিক্ষোভ, বিদ্বেষ, সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে, গুলি ছোটে, মানুষ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে…যন্ত্র বিভিন্ন দেশকে পরস্পরের কাছে আনতে সাহায্য করেচে; দূরত্বকে উড়িয়ে দিয়েচে। কিন্তু তার মোট লাভ কতটুকু? আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থের রেষারেষির দরুণ কয় বছর পর পরই সারা পৃথিবী জুড়ে এক একটা সর্ব্বনাশা যুদ্ধ বেধে ওঠে; মৃত্যু, ব্যাধি, অশান্তি, আর দুর্ভিক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ হাহাকার করে' ওঠে। এই কি সুখ? এই কি সভ্যতা? মানুষের মোট আনন্দের পরিমাণ যন্ত্র-সভ্যতার দরুণ কতটা বেড়েছে? একেই কি আমরা প্রগতি বলব? একেই কি আমরা সুখ বলে মেনে নেব? না, মহিম, এ-আদর্শ অন্তত আমার জন্য নয়। কারখানা-সভ্যতার পরিণতি সম্বন্ধে আমার আর কোনও মোহ নেই। এর হাত থেকে আমার চারধারের লোকদের আমি রক্ষা করতে চাই, বাঁচাতে চাই…'

'সিল্লী, সিল্লী, সিল্লী!' কেশব তার চেয়ারের হাতলে অধৈর্য্যভাবে ঘুষি মারিয়া কহিল। 'আপনি কি মনে করেন আপনার এসব মান্ধাতাই আইডিয়া দিয়ে আপনি সভ্যতার গতিরোধ করতে পারবেন? চরকা ঘুরিয়ে মেশিনের পথ আটকাতে পারবেন? আপনি বা আপনার মতো কয়েক ডজন সেকেলে লোক চান বা নাই চান, সভ্যতার চাকা এগিয়ে যাবে…'

'যাদের ওপর আমার কোনও প্রভাব আছে', দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সঞ্জীব শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় কহিল, 'অন্তত তারা যাতে এই চাকার তলায় পড়ে গুঁড়ো না হয়, সে-চেষ্টা আমাকে করতে হবে…'

'তোর কথার তাৎপর্য্য আমি ঠিক বুঝতে পারচি নে, সঞ্জীব।' মহিম আশঙ্কিত ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল। 'তুই কি আমাদের প্রচেষ্টায় বাধা দেবার জন্য লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াবি নাকি? তোর চ্যালাচামুণ্ডারা…'

'তারা যাতে নিজেদের হিতাহিত বুঝতে পারে', সঞ্জীব শান্তকণ্ঠে কহিল, 'তার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।'

এইবার কেশব উত্তেজনাভরে চেয়ার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 'আপনি ভয় দেখাচ্ছেন? আপনার ভয় দেখানোকে আমরা থোড়াই তোয়াক্কা করি। আপনার চ্যালেঞ্জ্ আমি দুই হাতে গ্রহণ করছি। পাঁচখানা গাঁয়ে উপদেশ খয়রাত করে' বেড়ান বলে নিজেকে ভারি ক্ষমতাশালী মনে করচেন। কিন্তু টাকার ক্ষমতা আরও কত বেশি, তা আপনি জানেন না। ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের আইন সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই, তাই হুম্‌কি দেখাচ্চেন। হুম্‌কি! আপনার চেয়ে অনেক প্রবল বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধেও আমি মিল খুলেছি। কতগুলি 'ফুলিশ্' বক্তৃতার সম্বল নিয়ে আপনি আর কতটুকু…'

মহিম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কেশবকে ধরিয়া তার চেয়ারে বসাইয়া দিল। অনমুমোদনের স্বরে কহিল 'তুমি টেম্পার লুজ করছ, কেশব। প্রতিবাদ করতে হলেই রেগে উঠতে হবে, এটা কোনও কাজের কথা নয়।' বলিয়া সে সঞ্জীবের দিকে অনুতপ্ত দৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু দৃঢ়তাপূর্ণ স্বরেই কহিল, 'সঞ্জীব, তুই আমার আবাল্য বন্ধু ও সুহৃৎ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আলাদা পথে যেতে পারব না। যখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের আইডিয়া পরস্পর-বিরোধী, তখন জোড়াতাড়া দিয়ে চলতে চেষ্টা করা নিরর্থক। এর চেয়ে বরঞ্চ তুই তোর পথে যা, আর আমরা আমাদের পথে এগুতে চেষ্টা করি। এতে যদি দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কা লাগে, তবে বরঞ্চ শক্তির পরীক্ষা হয়ে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। সেই ভালো…'

অন্যান্য দিনের মতোই আজও মহিম সঞ্জীবকে সিঁড়ির মুখ পর্যান্ত আগাইয়া দিয়া গেল, কিন্তু কেহ আর কোনও কথা বলিল না, নিঃশব্দে বিদায় লইল। তর্কের সকল অবকাশ দূর হইয়া মতবিরোধ দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাতে দুই বন্ধুই ভারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রায় স্খলিতপদে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিয়া সঞ্জীব অভিভূতের মতো কাঁকরের রাস্তায় পা দিল। একটা দুর্ঘটনার পর জগতটা যেমন অবাস্তব বোধ হয়, চন্দ্রালোকিত পৃথিবীটাকে আজ তেমনি অনির্ভরযোগ্য বোধ হইতে লাগিল। যেন একটা অপ্রত্যক্ষ সমর্থনের উপর নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই সে নির্ভর করিয়া আসিতেছিল, আজ অত্যন্ত সহসা সেই সহায়ক হাতটি দূরে সরিয়া গিয়াছে। এত বড় ক্ষতি পূর্ব্বে সে আর কখনও বোধ করে নাই।

'এই, শুনচেন?'

বাঁ দিকের প্রকাণ্ড কামিনীফুলের ঝাড়টার কাছ হইতে একটা শব্দ শুনিয়া সঞ্জীবের চিন্তাস্রোত বাধা পাইল। একটা ছায়া লম্বা হইয়া গাছের গোড়া হইতে পথের এক-প্রান্ত ছুঁইয়াছে। এই ছায়া অনুসরণ করিয়া সে কামিনীঝাড়ের একপাশে প্রতিমাকে আবিষ্কার করিল। বাগানের সর্ব্বত্র সকল সময়ে প্রতিমা যেমন যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে সিঁড়ির কাছে কামিনীগাছের ছায়ায় তাহাকে আবিষ্কার করায় আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু তবু সঞ্জীব চমকাইয়া উঠিল। আজ ঠিক এই মুহূর্ত্তে প্রতিমার সঙ্গে দেখা না হইলেই ভালো ছিল।

প্রতিমা কাছে আগাইয়া আসিল। ক্ষণকাল সঞ্জীবের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'যদি একটা অনুরোধ করি, রাখবেন কি? কোনও দিন কিছু চাইনি, আজ যদি চাই, প্রথম প্রার্থনাই কি নামঞ্জুর করে' দেবেন?'

'কি অনুরোধ, প্রতিমা?' সঞ্জীব কহিল।

'আগে বলুন রাখবেন?'

'অনুরোধ প্রথমে না শুনে কি প্রতিজ্ঞা করা যায়?'

প্রতিমা আর কথা বাড়াইল না। কহিল, 'দাদার এই কোম্পানীতে আপনি আসুন। এতে আমাদের সবারই ভালো হবে। দাদা আর কেশববাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আজ আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। আমাদের কারখানায় কারখানা-জীবনের কুফলগুলি যাতে দেখা না দেয়, তার সকল ব্যবস্থা করতে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেশববাবুর এদিকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বলেচেন, মালিকেরা ইচ্ছা করলেই এসব কুফল দূর করতে পারেন। তবে আর আপনি কেন আপত্তি করবেন? আমরা তো এ-অঞ্চলের সবারই উপকার করতে চাই। সবারই। এতে আমাদেরও, আপনার আর আমার···আমি আর স্পষ্ট ক'রে বলতে পারব না···'

'যাতে আমি বিশ্বাস করিনে,' সঞ্জীব কুণ্ঠিত অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'তাতে কি করে' রাজি হই, প্রতিমা? যা সারা গাঁয়ের পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলে আমার ধারণা, কি করে' তা আমি সমর্থন করি? এ গাঁয়ের চাষাভূষোরা আমাকে বিশ্বাস করে, আমার পরামর্শ শোনে। আশেপাশের দু-পাঁচখানা গাঁয়ের লোক আমাদের সমবায় সঙ্ঘকে আদর্শ স্থির করে এ পথে চলবার চেষ্টা করচে। নিজে যাকে বিপজ্জনক ক্ষতিকর বলে মনে করি, কি করে' এদের নতুন করে' সেই পথে চলতে পরামর্শ দিই? আমি ভণ্ড হলে কি তুমি খুসি হবে? আমি কপটতা করি, এই কি তুমি চাইতে পার?...'

'আমি কিছু শুনতে চাইনে, আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে,' প্রতিমা সানুনয় কণ্ঠে কিন্তু জেদের সঙ্গে কহিল। 'আপনাকে রাজি হতেই হবে। সব কিছু আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বোঝাতে আমার লজ্জা করে; কিন্তু আমাদের নিজেদেরও সুখী হওয়ার অধিকার আছে, আমাদের নিজেদেরও...আমি আর বলতে পারচি নে...কিন্তু আমি বলছি, আপনি রাজি হন...'

সঞ্জীব প্রতিমার মুখের দিকে একবার করুণদৃষ্টিতে চাহিল। তারপর কহিল, 'তুমি তো জানো, প্রতিমা, একটা আদর্শের জন্য আমি চাকরি ছেড়ে, শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে এসেছিলাম। কারখানার আবহাওয়া মানুষের সুখের এবং মর্য্যাদার হানিকর; নিজের বাড়ির শান্ত আবহাওয়ায় নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বসে, নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিনিষ তৈরির ব্যবস্থা করে' দিতে না পারলে মানুষ কখনই সুখী বা তৃপ্ত হ'তে পারবে না; কুটিরে কুটিরে শিল্পকে টেনে আনতে হবে, সেইখানেই আধুনিক সুবিধার ব্যবস্থা করে' দিতে হবে, এ-বিশ্বাস আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের চেয়েও প্রবল, তাও তুমি জানো। এই আদর্শ নিয়েই এ কয় বছর ধরে কাজ করে গেছি। সাফল্য হয়তো খুব বেশি লাভ করিনি, কিন্তু যতটুকু

করেছি, তাতে এর কার্য্যকারিতায় আমার বিশ্বাস বেড়েছে তো কমে নাই। তবে এখন হঠাৎ এ সমস্ত ছেড়ে, এত লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে', আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে কি করে' রাতারাতি মত-পরিবর্ত্তন করে ফেলতে পারি? তা হয় না, প্রতিমা। জোর করে' আমাকে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করো না…'

'আমার জন্যও কি এতে রাজি হ'তে পারেন না? আমাদের দুজনের সুখের জন্যও কি রাজি হতে পারেন না?' উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া প্রতিমা প্রায় বিকৃত কণ্ঠে কহিল।

'সুখের জন্য স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া কত বড় অধঃপতন, একবার ভেবে দেখেচ কি?' সঞ্জীব ক্লিষ্টস্বরে কহিল।

অপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিমা একবার সঞ্জীবের মুখে দৃষ্টিপাত করিল। এমন স্নিগ্ধ ভাষায় এমন রূঢ় প্রত্যাখ্যান সে যেন কল্পনাই করিতে পারে নাই। তার মনে এই গর্ব্ব ছিল যে, যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিগত আবেদন সেখানে জয়ী হইবে। এক মুহূর্ত্তে এই গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল।

'ওঃ, আচ্ছা, বেশ।' প্রতিমা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল। 'তবে আর অনুরোধ করব না।…আর অনুরোধ করব না। নমস্কার।' গালের উপর দুই চোখের জল হীরার মতো চকচক করিয়া উঠিল। নাসা স্ফুরিত, পেলব মুখের মাংসপেশী কুঞ্চনরেখাঙ্কিত, ওষ্ঠ কম্পমান।

সঞ্জীব কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রোদন-বিকৃত মুখের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া যেন পরাজয়ের সকল চিহ্ন ঢাকিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় প্রতিমা স্খলিত পায়ে ছুটিয়া পালাইল।

আট

মাঘ মাস পার হইল। ফাল্গুন কেবল শুরু হইয়াছে। এমন সময় একদিন দশার্ণপুরের বাসিন্দারা সজনেহাটের পথের দিকে চাহিয়া হাঁ হইয়া গেল। দিগ্বিজয়ী রাজার দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীর মতো মোটর ট্রাকের সারি গর্জ্জন করিয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া, ধূলায় আকাশ অন্ধকার করিয়া দশার্ণপুরের দিকে আগাইয়া আসিল। সারা গাঁয়ের লোক কাজ ফেলিয়া ছুটিল ; মেয়েরা অন্তঃপুর হইতে সকৌতূহলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা গ্রামের ইতিহাসে ঘটে নাই।

অভিযানকারী বাহিনী ক্রমে পলাশডাঙার মাঠে আসিয়া হাজির হইল। দলে দলে লোক ট্রাকের ভিতর হইতে লাফাইয়া নিচে নামিল তাঁবু, বাঁশ, তক্তা, রাসারসি নামিল। হৈ-চৈ চিৎকারে, হাতুড়ি ও কোদালের কর্ম্মচাঞ্চল্যে সারাটা রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। গ্রাম্য পথের ধূলা উড়াইয়া লরিগুলি বেপরোয়া ভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; বর্গীর দলের মতো দলে দলে লোক আসিয়া বিনা অনুমতিতেই এ-বাগান ও-বাগান হইতে কলাপাতা কাটিয়া লইয়া গেল ; পরাণ মুদির মুদিখানার যাবতীয় পণ্য চক্ষের নিমেষে বিক্রয় হইয়া গেল। মহামারীর মর্শুমের সময় শ্মশানে যেমন শত শত চিতা জ্বলিয়া ওঠে, পলাসডাঙার মাঠে তেমনি অসংখ্য চুলা জ্বলিয়া উঠিল। আরও নতুন ট্রাক্ গর্জ্জন করিতে করিতে হাজির হইল ; নতুন মানুষ ও নতুন মাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমদানি হইতে লাগিল ; ঘুমন্ত দশার্ণপুর যন্ত্র ও যন্ত্রীর কলরবে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল।

যেন একটা মেলা বসিয়া গেছে। পলাশডাঙার মাঠ আশ্চর্য্য

দ্রুততার সঙ্গে কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে, এমন আর কিছুতেই করে না। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আর পলাসডাঙার আশপাশ হইতে নড়ে না। বড়রাও সময় পাইলেই এখানকার আবুহোসেনী কাণ্ডকারখানা দেখিতে আসে। নিরাপদ দূরত্ব হইতে গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা পর্য্যন্ত ইহার কর্ম্মতৎপরতার খবরাখবর লইয়া থাকে।

কনট্রাক্টরবাবুদের তাঁবু এবং কুলি-মজুরদের ছাউনি পলাশডাঙার তিন দিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভিং খোঁড়ার কাজ শুরু হইয়াছে মাঠের বুকে: মাটি কাটার কল সারাক্ষণ ভক্ ভক্ করিতেছে। ভিন্‌দেশী কুলির বাহিনী এই মাটি ভারে ভারে সংগ্রহ করিয়া রাস্তাটার দুপাশে ঢালিয়া রাস্তা চওড়া ও মজবুত করিতেছে। মাটি কাটার ফলে কোথাও জল উঠিলে সেই জল পাম্প করিয়া পাশের দীঘিটার ফেলা হইতেছে, আবার প্রয়োজন মত ইট-ভিজাইবার চৌবাচ্চাগুলিতে চালান আনা হইতেছে। ইটের পর ইট সাজাইয়া তাঁবু ও কুলি-ছাউনির পাশে যেন দেওয়াল খাড়া করা হইল। টিনের চালার ছাউনিগুলিতে চুণ ও সিমেণ্টের ব্যাগ স্তূপ করা। লরি লরি টিন প্রত্যহ চালান আসিতেছে।

চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম-ব্যস্ততা। রাজমিস্ত্রীরা হাফপ্যাণ্ট-পরা কনট্রাক্টর ও ঠিকাদারদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া সর্ব্বত্র হাজার রকম মাপ-জোক করিতেছে। পশ্চিমা স্ত্রীপুরুষেরা দিনমান খুটখুট করিয়া খোয়া ভাঙিতেছে; অসংখ্য লোক ভিং দুরমুষ করিতেছে। রাত পর্য্যন্ত কাজ চলে। অ্যাসেটেলিন আলোগুলি অজগরের চোখের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া সারা পলাসডাঙাকে ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল করিয়া তোলে। তারপর রাত আরও বেশি হইলে কুলি-ছাউনিতে হয় তো মাদল বাজিয়া ওঠে; হাসির হর্‌রা ও দুর্বোধ্য গানের গর্‌রায় নৈশ-আকাশ মন্দ্রিত হয়। দশার্ণপুর এই নতুন জীবনধারার প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

প্রথম কিছুদিন গ্রামের অধিবাসীদের উপেক্ষা করিয়াই এই সমারোহ চলিয়াছিল, তারপর একদিন এই নির্বাক দর্শকদের কাছে সংবাদ পৌছিল যে, পূবদিকের বড়ো তাঁবুটার মধ্যে লোক-ভর্ত্তির অফিস খোলা হইয়াছে। কাজের তারতম্য অনুসারে বড়দের দৈনিক একটাকা হইতে তিনটাকা হারে ও ছোটদের ইহার অর্দ্ধেক হারে কাজে ভর্ত্তি করা হইতেছে।

প্রথম দু'চারদিন দর্শকেরা ভয়ে ভয়ে একে অপরের আচরণ লক্ষ্য করিয়া কাটাইল। ক্ষেতের কাজ নাই বলিলেই চলে। সঙ্ঘে কাজ করিলে কিছু আয় হয়, কিন্তু তাহার হার সামান্য। অথচ পলাসডাঙার এই রহস্যময় অফিসে লোভনীয় পারিশ্রমিকে লোক ভর্ত্তি করা হইতেছে। লোভ হয়। কিন্তু ইহারা কাণাঘুষা শুনিয়াছে, দা-ঠাকুর নাকি ইহা পছন্দ করেন না। পতিতপাবন ও বিশ্বম্ভরদা তো ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে: 'ওখানে নিত্যিনিত্যি আদেখ্‌লার মতো কি দেখতে যাস্‌ শুনি? কুলি হতে চাস্‌?' কুলি! নামটা ইহাদের ভালো লাগে নাই। গ্রামের ছেলে তারা, কুলি হওয়াটা অপমানজনক মনে করে। তারা খাটিয়া খায় বটে, কিন্তু তাহারা কুলি নয়, কৃষাণ।

দু'চারটা বখা ছেলে পান-বিড়ির পয়সার জন্য ইতিমধ্যেই কলের বাবুদের কাছে নাম লেখাইয়া আসিয়াছে। কারখানার শহরে নাপিতের কাছে দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া, জুতো পায়ে দিয়া, মুখে শস্তা সিগ্রেট ফুঁকিয়া সারা গ্রামের কাছে নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতার বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করিয়াছে। টাকার জরুরি প্রয়োজন হইলে আরও দু'পাঁচ জনে চুপে চুপে আসিয়া দু'পাঁচ দিন খাটিয়া আবার সরিয়া পড়িয়া নিজেদের কৌলিন্য অব্যাহত রাখিতেছে।

দেখিতে দেখিতে পলাসডাঙার সীমানায় দুটো চা-চপের দোকান গজাইল। একদিন সহসা একটা তাড়ির দোকানও আত্মপ্রকাশ করিল। দশার্ণপুর টেক্সটাইল মিল্‌স্‌ তৈরি করিতে যে সব মজুরেরা গলদঘর্ম্ম

হইতেছে, এটি তাহাদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের কে নাকি ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কনট্রাক্টরবাবু এই আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন। কোনও রকম উত্তেজক পানীয় না পাইলে কুলিদের পক্ষে এমন একটানা কঠিন পরিশ্রম করা সম্ভব হইবে কেন। চৈত্র মাসের মধ্যে মিলের একটা অংশ সমাপ্ত করিতে হইবে। পয়লা বৈশাখ মিলের কাজ আরম্ভ হওয়া চাই, কেশবের হুকুম এই। ইহা সম্ভবপর করিবার জন্য কনট্রাক্টরদের সঙ্গে কেশব নিজেও খাটিতেছে। অসম্ভব তাহার খাটিবার শক্তি ও উৎসাহ। তাহার উৎসাহে সে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে চায়। নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত করিতে পারিলে সকলকেই বিশেষ বোনাস্ দেওয়া হইবে বলিয়া সে ঘোষণা করিয়াছে।

অদ্ভুত কাজ-পাগ্‌লা লোক কেশব। প্রতিটি খুঁটিনাটি তার তত্ত্বাবধান করা চাই। এ কাজে ছুটিবে, ও কাজে ছুটিবে; প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিকে প্রতি উপদেশ ও আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিবে। ভোরে হয়তো দুষ্প্রাপ্য মশলার খোঁজে কলিকাতায় ছুটিল, কার্য্যোদ্ধার করিয়া আবার দুপুরের মধ্যেই সে দশার্ণপুরে হাজির। তার পরিশ্রম নাই, ক্লান্তি নাই। কারখানার বাড়ি সমাপ্ত না হইলে গল্প-বর্ণিত দৈত্যের মতো সে-ও যেন শান্তি পাইবে না, বিশ্রাম করিবে না। একাধিক মধ্য-রাত্রে জমিদার বাড়ি হইতে গাড়ি হাঁকাইয়া সে পলাসডাঙায় ঠিকাদারদের তাঁবুতে হাজির হইয়াছে, এবং পরিশ্রান্ত বিরক্ত বাবুদের ঘুম ভাঙাইয়া পরের দিনের কাজের পরিবর্ত্তন বা আলোচনা করিয়াছে, যাহাতে ভোর-বেলায় কাজ অগ্রসর হইতে অনাবশ্যক দেরি না হয়।

প্রায়ই সে মহিম ও প্রতিমাকে লইয়া আসে। সব কিছু দেখায়, সকল কিছুর সার্থকতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সেদিন অর্দ্ধসমাপ্ত মিল-বাড়ির দিকে মুগ্ধ চোখে চাহিয়া সে উচ্ছসিত গলায় বলিল:

'আমি যেন দুচোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই বৈচিত্র্যহীন, বর্ণ-হীন একঘেয়ে গ্রামে একটা সম্পদশালী সুন্দর শহর জেগে উঠেচে···চওড়া চক্‌চকে রাস্তা, পাকা বাড়ি, বৈদ্যুতিক আলো, কত লোক, কত কাজ!··· আর মাস দুয়েক। তারই মধ্যে কারখানায় কাজ শুরু হয়ে যাবে। ক্রমে দশার্ণপুর কর্ম্মচাঞ্চল্যে টগবগ করতে থাকবে। নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে, লোকের হাতে পয়সা আসবে, তাদের জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে। মিল যতোই বড় হ'তে থাকবে, দশার্ণপুরের সমৃদ্ধি ততই বাড়বে। একটা মরা গ্রাম জীবন্ত হয়ে উঠে বিজ্ঞানের সকল সুবিধার সরিক হ'তে সমর্থ হবে। আর এ সমস্তের মূলে রয়েছেন আপনি মহিমদা, এবং তার চেয়েও যা আশ্চর্য্যের, একজন বাঙালি মহিলা!···' বলিয়া কেশব প্রতিমার দিকে শুধু সশ্রদ্ধ নয়, প্রায় সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাইল।

প্রতিমা ভালোমন্দ কিছু বলে না। কিন্তু মহিম প্রায়শই কেশবকে সাবধান করিয়া দেয়। বলে, 'মজুরদের সুখ-সুবিধার দিকে যেন সব সময়ে নজর রাখা হয়। কারখানার যেটা নিন্দনীয় দিক, আমরা যেন তার পুনরাবৃত্তি না করি···'

'তা তো নিশ্চয়। আমাদের প্ল্যানে সব সুব্যবস্থা করা হয়েছে।' কেশব তাহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সঙ্গে বলে। 'কিন্তু সবার আগে, কাজ শুরু। আগে মিল চালু করা চাই। কাজেই আমি কারখানার দিকেই এখন সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেচি। প্রথমটা প্রথমে করতে হবে।···আপনাদের সঞ্জীববাবু শত্রুতার কোনই কার্পণ্য করচেন না। লোক দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। বলছেন, 'কলের মজুর তো কুলি! গাঁয়ের চাষী তোরা, মাটির ছেলে, তোরা কি শেষে কুলি হবি! কল শয়তান, কাছে ঘেঁষেছিস তো মরেচিস'···সব মামুলি নন্‌সেন্স আর কি। ভদ্রলোক জানেন না যে, প্রচার দিয়ে প্রকৃতির আইনকে বরবাদ করা যায় না। অর্থনীতির আইন অমোঘ। দলে দলে লোক এসে কারখানা তৈরির

কাজে যোগ দিচ্ছে। প্রথমে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গিয়েছিল—সঙ্ঘের লোকেরা কি বলবে, সমাজের লোকেরা কি বলবে। কিন্তু সে ভয় প্রায় কেটে গেচে মনে হয়। অন্তত আমাদের যতটা দরকার তার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মজুর দশার্ণপুর এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। যে কাজে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাতে অন্যান্য কাজ থেকে মজুর আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।··· আপনাদের সেই স্বপ্নবিলাসী ভদ্রলোকের প্রতি আমার কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই, কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতিতে তার মনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েচে, তা জানতে কৌতূহল হয়। হাতে জরুরি কাজ না থাকলে একদিন তার আশ্রমে হাজির হয়ে জেনে আসা যেত···'

ব্যক্তিগতভাবে সঞ্জীবের কথা উঠিলে ভাইবোন উভয়েই গম্ভীর হইয়া যায়। তাহাকে লইয়া কোনও আলোচনা করে না। ইহা তাহাদের ক্ষতস্থান। আজও তাহারা এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিল না।

গত দুই মাসে সঞ্জীব একদিনও আর তাহাদের বাড়ি আসে নাই। তাহারাও ডাকে নাই। মাঝে একবার তারা কলিকাতা গিয়াছিল, কিন্তু কারখানা তৈরি শুরু হওয়া মাত্র গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে প্রায় দেড় মাসের কথা। সপ্তাহে অন্ততঃ দু'তিন দিন প্রতিমা গাড়িতে চড়িয়া পলাশডাঙার মাঠে কারখানা তৈরির কাজ দেখিতে যায়, কিন্তু একদিনও পথে সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কিছুটা ঘুর-পথ হইলেও আগে কেশব গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের পাশ দিয়াই যাতায়াতের পক্ষপাতী ছিল। প্রচুর হর্ণ টিপিয়া, গাড়ির চাকার সাহায্যে বিস্তর ধূলা উড়াইয়া সে নিজের অস্তিত্ব জাহির করিয়া যাইত। প্রতিমার কাছ হইতে একদিন ধমক খাইবার পর আর সে তাহাকে ঐ পথে লইয়া যায় না। অথচ সঙ্ঘের আঙিনায়ও প্রতিমা সঞ্জীবকে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে নাই। সে খবর লইয়াছে, সঞ্জীব এখানেই আছে, নহিলে প্রতিমা অনায়াসে মনে

করিতে পারিত যে, গ্রাম ছাড়িয়া সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য সহকারে সজীব প্রতিমার কাছ হইতে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন বোধহয় তিথিটা শুক্লা তৃতীয়া হইবে। ক্ষীণ চাঁদের আবির্ভাবে দুর্ব্বল জ্যোৎস্নায় গ্রামের দিগন্ত পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নিজেদের বাড়ির সমুখের চওড়া সিঁড়িগুলির একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সারাটা পৃথিবীকেই প্রতিমার কাছে করুণ এবং অবাস্তব বোধ হইল। রূপালি খাল পার হইয়া, ধূসর ক্ষেতগুলি পার হইয়া দৃষ্টি যেন অতিশয় সসঙ্কোচে সঙ্ঘের কুটিরাবলীর কাছে উপস্থিত হইল। ওদিকে চাহিতেও আজকাল প্রতিমার কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, যেন অতিশয় নিকট আত্মীয়কে এক নির্জ্জন দ্বীপে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা একদিন চোরের মতো পা টিপিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই উপমা যে যথার্থ নয়, যুক্তি দিয়া নিজেকে সে ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করে।

'যাক্ গে!' চোখ সরাইয়া আনিয়া অবশেষে প্রতিমা নিজ মনে কহিল, 'যে নিজে আসতে চায় না, তাকে জোর করে টেনে এনে কি লাভ হবে। সে যদি ভুলতে পারে, আমিও ভুলতে পারব···'

'কি ভাবচেন, বলুন দেখি?'

প্রতিমা চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিল। দিনান্তের পরিশ্রমেও অক্লান্ত কেশব দুই ধাপ নিচে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। পরণে কাজের পোশাক; শাদা শার্টটা ধূলায় গৈরিক চেহারা ধারণ করিয়াছে। নিচে তার স্পোর্টিং মোটর দাঁড়ানো। এইমাত্র সে কাজ হইতে ফিরিয়াছে।

'আপনার কবি হওয়া উচিত ছিল,' অবিশিষ্ট সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া

কেশব প্রতিমার কাছে হাজির হইল। 'একমাত্র কবিরাই অমন ভাবে তাকিয়ে থাকে বলে শুনেছি।···তবে, হ্যাঁ, পলাসডাঙার মাঠে ইট কাঠ চুণ সুরকি লোহালক্কড় দিয়ে যা তৈরি করাচ্ছেন, তাও কম বড় কবিতা নয়। এর চেয়ে বড় কল্পনা কোন্ কবিতায় পাবেন? শুধু কথার কবিতা নয়, আপনি কাজের কবিতা সৃষ্টি করচেন। সকল সৃষ্টির মূলেই আছে নারী; আমাদের এই আশ্চর্য্য কবিতার উৎস এবং অনুপ্রেরণা হলেন আপনি।···'

'চায়ের জল তৈরি আছে, স্নান করে' নিন,' প্রতিমা মামুলি কণ্ঠে কহিল।

নয়

পয়লা বৈশাখ টাইম-টেব্‌ল্‌ অনুযায়ীই অর্দ্ধ-সমাপ্ত দশার্ণপুর টেক্সটাইল মিলস্‌-এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইল। কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য; শিল্পপতি ও সাংবাদিক আসিল; জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী সোনার চাবি দিয়া রূপার তালা খুলিলেন; দেশের শ্রম-শিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ বক্তৃতা হইল; বিলিতি ব্যাণ্ড সারাটা গ্রাম সরগরম করিল পলাসডাঙার মাঠের কারখানাবাড়ির একাধিক চিম্‌নি হইতে ধোঁয়া বাহির হইল, এবং শেডের উপরকার 'সাইরেন' গর্জ্জন করিয়া কারখানার জন্ম ঘোষণা করিল।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়াছিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বেই কারখানার শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সগর্ব্বে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশীদের ঈর্ষ্যা উৎপাদন করিয়া ছাড়িল। ইহারা পেট ভরিয়া খাইল, দৌড়ের পাল্লায় জিতিয়া পুরস্কার পাইল, সন্ধ্যাবেলা বিনা পয়সায় বায়স্কোপ দেখিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরের দিন বহু লোক আসিয়া কারখানায় কাজের জন্য আবেদন করিল। ক্রমে আরও লোক আসিল। কর্ত্তৃপক্ষ লোক-সংগ্রহে আর বড়ো গা দেখায় না। তখন জনতা পূর্ব্বের হারের চেয়ে চার ছ' আনা কম মজুরিতেই কাজ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিছুদিনের মধ্যেই কারখানার ভিতর হইতে গাঁট-বোঝাই লরি গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া, গ্রাম্য পথের ধূলা উড়াইয়া, বিদ্যুৎবেগে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল। হাসপাতালের বাড়ি তৈরি হইল; স্কুলবাড়ির কাজ সমাপ্ত হইল, কুলি-লাইনের ভিৎ গাড়া

শুরু হইল। আরও চায়ের দোকান গজাইল ; একটা দেশী মদের দোকান ও গোটা কয়েক মনোহারি দোকানের আমদানি হইল। কারখানা অঞ্চলে এমন দু-পাঁচটি অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রীলোককে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখা গেল, যাহারা কারখানার মজুর বা মজুরদের পরিবারভুক্ত নয়।

কেশব একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। কাজ তার ব্যসন, কাজ তার জীবন। কলের সিটি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার মজুরদের মতো সেও কারখানায় ছুটিয়া আসে। দুপুরে একবার খাইতে না গেলে প্রতিমা এবং মহিম দুজনেই রাগ করে বলিয়া মাঝে তাহাকে খাইতে যাইতে হয়, কিন্তু তাহার সমস্ত মন কারখানায় পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক এঞ্জিনীয়ার এবং প্রত্যেক টেক্‌নিশিয়ানের কাজের সে স্বয়ং তদারক করে। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে লোক কেশব ; কাজ একেবারে নিখুঁত না হইলে তার সন্তুষ্টি নাই। সারাক্ষণ সে কলকব্জা এবং কারখানার অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতির কথা লইয়া মাথা ঘামাইয়া একশেষ হয়। প্রত্যহ নতুন নতুন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া সে নিজের এবং অনুচরবৃন্দের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া থাকে। কেশব নিজেও যেন বিবিধ যন্ত্রপাতির মতো আর একটি যন্ত্র। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই, আশ্চর্য্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করিয়া চলিয়াছে। নতুন রং, নতুন সুতো, নতুন পাড়, নতুন বুননি সম্বন্ধে তার কৌতূহল অফুরন্ত। আজ উৎপাদনের যে হারে সে খুসি, কাল তাহাতে সে সন্তুষ্ট নয়। আরও কাজ দাও, আরও বেশি মজুরি পাইবে। আরও উচ্চ-হারে ওভার টাইম পাইবে, কিন্তু আরও বেশি কাজ চাই। এ মাসের উৎপাদনের অঙ্কটা গত মাসের চেয়ে নিদেন পক্ষে শতকরা দশগুণ বাড়া চাই। শস্তায় চাউল পাইবে, ডাল পাইবে, বিনামূল্যে ওষুধ ও ডাক্তার পাইবে, বিনা খরচায় ছেলে পড়াইতে পারিবে, কিন্তু তার বদলে কাজ চাই, বেশি কাজ চাই, আরও কাজ চাই!

প্রথম বৎসরেই কেশব একটা সম্ভ্রান্ত ডিভিডেণ্ড দেখাইতে চায়। কারখানার সার্থকতার এবং নিজের কর্ম্মদক্ষতার ইহাই হইবে অভ্রান্ত প্রমাণ। অংশীদারেরা লভ্যাংশের অঙ্ক দিয়াই তাহাকে বিচার করিবে; মহিম এবং প্রতিমা তাহার উপর যে আস্থা দেখাইয়াছে ইহার দ্বারাই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। ইহার উপর আছে তার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। অসম্ভব সম্ভব করিবার মতো ক্ষমতা আছে তার, আর পাঁচজনের কৃতিত্বকে ম্লান করিয়া দিবার মতো কর্ম্মকুশলতা আছে। ইহার সদ্ব্যবহার না করিয়া তার শান্তি নাই। কে বলে মানুষ শুধু টাকার জন্য খাটে!

'দেশে কাপড়ের মন্দা পড়েচে,' সে তাহার কর্ম্মীদের উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বলে, 'তোমাদের উপর দেশবাসীর লজ্জা-নিবারণের ভার। এত সামান্য উৎপাদন করলে চলবে না। আরও বেশি কাপড় তৈরি করতে হবে। আরও কাজ চাই, আরও কাজ চাই…':

দিন-রাত জুড়িয়া তিন শিফ্‌টে কাজ চলে। কলের সিটি ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিয়া বিভিন্ন সঙ্কেত দেয়। সারারাত ধরিয়া বয়লার টগবগ করে, ডায়নামো গর্জ্জন করিতে থাকে, বৈদ্যুতিক তাঁত ঘর্ঘর করে, চিম্‌নির ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইয়া নৈশ-আকাশে হাউইয়ের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়।

আগের সন্ধ্যায় একটা নতুন মেশিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কেশবের রাতারাতিই সেটা বসাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার আগেই মিস্ত্রী ও টেক্‌নিশিয়ানদের অনেকে বাড়ি চলিয়া গিয়াছে; মেশিনটা আজই আসিয়া পড়িবে, কেশব আশা করে নাই। একবার ভাবিল, উহাদের ডাকিয়া পাঠায়। কিন্তু উহাদের জড়ো করিতে রাত দুপুর হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া পরে সে নিরস্ত হয়।

কিন্তু রাতে তার ঘুম হইল না। বিছানায় শুইয়া রাতটা সে প্রায়

ছটফট করিয়া কাটাইল। সকালে যথাসময়ের এক ঘণ্টা আগে সে কারখানায় ছুটিয়া আসিল এবং কাছাকাছি যাহাকে পাইল তাহাকেই পাকড়াও করিয়া নিজের শার্টের হাতা গুটাইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

কলের মিস্ত্রীরা যথাসময়েই হাজির হইয়াছিল, কিন্তু তবু তারা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সাহেব নিজে কাজে নামিয়াছেন, ইহা নিজেদের অপরাধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

'এবার ছেড়ে দিন, হুজুর। এবার আমরাই করচি।' মিস্ত্রীরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া কহিল।

'কথা না বলে কাজে লেগে যাও,' প্যাঁচ কষিতে কষিতে কেশব কারখানা-সুলভ কঠিন কণ্ঠে কহিল।

রেঞ্চ্‌, স্ক্রু-ড্রাইভার, তেলের ক্যান্‌ এক হাত হইতে অন্য হাতে ওড়াউড়ি করিতে লাগিল। কুলিদের 'হেইয়ো জোয়ান' শব্দে, হাতুড়ির ঠকাঠকে, কেশবের তীক্ষ্ণ আদেশে নতুন মেশিনের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিতে লাগিল। উৎসাহ যত প্রবল, কাজ কিন্তু তত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় না; জটিল যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নমুনা-অনুযায়ী অতি সাবধানে জোড়া লাগাইতে হয়। মেশিনের কালি ও তেলে সকলেই ভূত সাজিল! শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল। পরিশ্রমে প্রায় প্রত্যেকেরই মুখ লম্বা ও কঠিন আকার ধারণ করিল। অথচ কখন যে কাজ শেষ হইবে, তার কিছুই ঠিক নাই।

কারখানার বৈদ্যুতিক ঘড়িটাতে দুটো বাজিবার শব্দ হইল। মিস্ত্রী অবিনাশ গোড়া হইতেই কেশবের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, ঘড়ির শব্দ শুনিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া সময়টা লক্ষ্য করিল, এবং একবার ইতস্তত করিয়া কহিল, 'দুটো বেজে গেল, সাহেব। কর্ত্তা-বাড়ি থেকে দু-দুবার আপনাকে ডাকতে লোক এসেচে। কতক্ষণে এ শেষ হবে, কিছু ঠিক নেই, এবার খেয়ে নিলে হ'তো না?…'

কেশব মেশিনটার একপ্রান্তে দেবার্চ্চনার ভঙ্গিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্ক্রু আঁটিতেছিল। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া, মুখের মাংসপেশী শক্ত এবং চোখের দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে যেন কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছিল। অবিনাশ তাহার পরামর্শের পুনরুক্তি করিবার পর সে কথাটা শুনিতে পাইল। চোখ উঠাইয়া কহিল, 'কি বলচ ?'

'আজ্ঞে, বেলা দুটো বেজেচে। এবার খেয়ে নিলে হতো না ? কর্ত্তা-বাড়ি থেকে...'

'খেতে যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেচ, দেখচি।' কেশব তীক্ষ্ণ বিরস কণ্ঠে কহিল। 'কচি ছেলে, খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিলে হয় না ! আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। কাজটা তবে কিছু নয়, কাজটা পড়ে থাকতে পারে। কাজ যতই জরুরি হোক, তোমার টিফিন খাওয়ার সময় পার হলে চলবে না। লজ্জা করল না একথা বলতে ? এই তো এরা সব কাজ করচে, আর কে এমন কথা বলেচে ? এদের খিদে পায় না ? আমার খিদে পায় না ? এক কাপ মাত্র চা খেয়ে আমি বের হয়েচি। তুমি তার চেয়ে কিছু কম খেয়ে আসোনি। এ চলবে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাজ করা আমার এখানে চলবে না। কাজের ওপর যে আরামকে জায়গা দেয়, তার স্থান এখানে নয়। তাকে আমি সহ্য করি না।...খিদেতে একেবারে গলে যাচ্চ !...'

'আমার অন্যায় হয়েচে, সাহেব। এবারটি মাফ করুন।' অবিনাশ কাঁচুমাচু মুখে নিজের কাজে মন দিল।

'ঠিক আছে।' কেশব অতি সহজেই তাকে ক্ষমা করিল। 'কাজের সময় কাজ, এই আমি বুঝি।...আরে, না, না, ওদিকে নয়, ওদিকে নয় ! উল্টো বসিয়েছ। তোমার আজ হয়েচে কি শুনি, অবিনাশ ? সত্যিই খিদে পেয়েচে দেখচি। কিন্তু হাতের কাজটা শেষ না করে নয়।...খেটেছে আজ ধনঞ্জয়। সাবাস্, মিস্ত্রী। ওটুকু আর বাকি রেখো না...' বলিয়া

নিজের হাতের কাজ ফেলিয়া কেশব ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ধনঞ্জয় পাকড়াশির দিকে আগাইয়া গেল। সকলেই দুপুরের ছুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, অবিনাশের দুর্গতি লক্ষ্য করিবার পর উদ্যমের ভান করিয়া সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত রহিল।

সহসা জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জনের সাড়া পড়িয়া গেল। সশ্রদ্ধভাবে মজুর ও মিস্ত্রীরা সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে সকলে যেন অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। কেশব কাজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাণপণে রেঞ্জের প্যাঁচ কষিতেছিল, সহকর্ম্মীদের নিষ্ক্রিয়তা উপলব্ধি করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল এবং তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পিছনে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

'আরে, আপনি এখানে!' কেশব প্রতিমার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল। 'আমাকে অফিস-ঘরে ডেকে পাঠালেই পারতেন। অসম্ভব গরম এখানটায়। আর কালি-ঝুলি মেখে আমাদের সব যে রকম চেহারা দাঁড়িয়েচে, তা যে অভ্যর্থনা করার উপযুক্ত নয়, আয়নাতে নিজেদের না দেখেও তা সহজেই বলতে পারি। কিন্তু মেশিনটা সন্ধ্যার আগেই রেডি করতে হবে। আজই নাইট্‌-শিফ্‌টে ওটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই…'

'তার আগে অনুগ্রহ করে একবার বাড়িতে এসে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে গেলে উপকৃত হবো।' প্রতিমা গম্ভীর ভাবেই কহিল। 'আর কতক্ষণ আমাদের বসিয়ে রাখতে চান, শুনি?'

'এখনও আপনারা খান নি!' কেশব সবিস্ময়ে কহিল। 'কি সর্ব্বনাশ! এ রকম কেন করেন! আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ না হয় আমাকে বাদ দিন। কি জানেন, প্রতিমা দেবী, আজ আমার নড়ার উপায় নেই। চট্‌পট মেশিনটাকে চালু করা দরকার। একদিন লাঞ্চ্‌ বাদ পড়লে আমার এমন কিছু…'

'ওসব শুনতে চাইনে। খেতে আসুন।' বলিয়া প্রতিমা আর কথা না বাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

এই আদেশ এতই সুস্পষ্ট এবং কড়া যে অগত্যা কেশবকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে সে এঞ্জিনীয়ার ও মিস্ত্রীদের বিস্তৃত উপদেশ দিয়া কাজ চালু রাখিতে হুকুম দিয়া গেল। কিন্তু মনে মনে সে বেশ জানে, সে পিছন ফেরামাত্র প্রত্যেকেই কাজ ঢিলা দিবে। কাজ সামান্যই অগ্রসর হইবে।

'এখন মজাটি কেমন!' অবিনাশ মিস্ত্রী ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ধনঞ্জয়ের দিকে দুষ্টুমি-ভরা চোখে চাহিয়া পরিতৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, 'সুড়সুড় করে খসে পড়তে পথ পেলে না। যেমন সাপ, তার তেমনি ওঝা! এসো, এবার পালা করে জিরিয়ে নেওয়া যাক্।'

'যা বলেচ, অবিনাশ।' ধনঞ্জয় মেঝেতেই ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া কহিল। 'একবার যে বিড়িটা ধরাবো তার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না! তবে, হ্যাঁ, এও বলব, সাহেবের সঙ্গে খেটে সুখ আছে। কাজ জানে...'

প্রতিমা নিজেই গাড়ি চালাইয়া আসিয়াছিল। এইবার কেশব সাগ্রহে ড্রাইভারের কাজটা চাহিয়া লইল। দুপুরের রৌদ্রে ঝলসাইয়া-ওঠা মোটরটা গ্রাম্য পথের গৈরিক ধূলা উড়াইয়া ঝড়ের মতো ছুটিতে আরম্ভ করিল।

'এইবার কারখানার 'রিসোর্সেস্' পুরোপুরিই কাজে লাগানো যাবে আশা হচ্চে।' সমুখের পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কেশব পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রতিমাকে তৃপ্তিভরা কণ্ঠে কহিল। 'এ যন্ত্রটারই অভাব ছিল বলে যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম। এটা চালু হবার পর হয়তো বলতে পারব, মাত্র ছ' মাসে আমরা যে কাজ করেছি, তা নিয়ে গর্ব্বিত হওয়া চলে...'

'কিন্তু তা বলে,' প্রতিমা সদয় কণ্ঠেই কহিল, 'এ রকম খাওয়া বাদ দিয়ে আমার বুড়ি মাকে বিব্রত করা চলবে না।'

'আপনি নিজেও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন না তো?' কেশব একটু মুচকি হাসিয়া দুষ্টামি করিয়া কহিল।

'ভদ্রতার নিয়ম পালন না করে উপায় কি?'

বস্তুতঃ এই কাজ-পাগ্‌লা অনন্যনিষ্ঠ লোকটির প্রতি প্রতিমা নিজেও কিছুটা স্নেহ এবং যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ না করিয়া পারে না। খাওয়া-নাওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বদাই ইহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হয়। এক কাজ ছাড়া কোনও দিকেই ইহার খেয়াল নাই। কেশবের প্রতি প্রতিমার একটা বিরক্তির ভাবই ছিল। কিন্তু যতই সে ইহার আলুথালু ভাব এবং কাজের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা লক্ষ্য করিতে লাগিল, ততই বিরক্তির জায়গায় সহানুভূতি, এমন কি, কিছুটা সম্ভ্রমের উদয় হইল। এখনও তাহার আচরণে উত্তাপের অভাব আছে, কিন্তু আগের তিক্ততা আর নাই।

'এরই মধ্যে আমাদের কারখানার মালের সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে।' কেশব বলিতে লাগিল। 'এর পাড় আর বুনানি দুয়েরই নাম হয়েচে। আর দু'চার মাসের মধ্যেই শেয়ার-মার্কেটে আমাদের কোম্পানীর শেয়ারের লেন-দেন শুরু হবে, এ আমি বলে দিলুম। সরকারি ভাবে বেচা-কেনা শুরু না হলেও, এরই মধ্যে আমাদের শেয়ার প্রিমিয়মে বিক্রি হচ্ছে; এবার শীগগিরই স্টক-এক্সচেঞ্জকে আমাদের শেয়ারকে স্বীকার করে নিতে হবে। প্রথম বৎসরের হিসেবে যদি একটা সম্ভ্রান্ত ডিভিডেণ্ড দেখাতে পারি, তা হলেই হয়…'

'শুধু তাতে হবে না।' প্রতিমা কহিল। 'মজুর-কল্যাণের জন্য কি কি করেছেন, তার হিসেব দিতে হবে…'

'দেব বৈকি, নিশ্চয়ই দেব।' কেশব সগর্ব্বেই কহিল। 'এক বৎসরের পক্ষে সে রেকর্ড এমন কিছু খারাপ নয় যে, সঙ্কোচ বোধ করব।…হাস-

পাতাল, লাইব্রেরি···তারপর সেদিন তো ইস্কুলটাও খোলা হলো। এখনও তাতে যথেষ্ট ছাত্র হয়নি বটে, কিন্তু শীগগিরই হয়ে যাবে; সঞ্জীববাবুর পাঠশালাটিও তার 'আশ্রম'টির মতো চুরমার হয়ে যাবে···'

সহসা প্রতিমা চম্‌কাইয়া আবিষ্কার করিল, তাহাদের গাড়ি 'সঙ্ঘের' সমুখ দিয়া ছুটিতেছে। এক সেকেণ্ডে প্রতিমার শিরদাঁড়ার মধ্যে বিদ্যুতের একটা শিহরণ যেন সর্পিল গতিতে ছুটিয়া গেল।

সারাটা সঙ্ঘকেন্দ্রকেই জন-পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথম যেদিন প্রতিমা সঙ্ঘের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে, উৎসাহ এবং আনন্দে সমস্তটা জায়গা যেন টগবগ করিয়াছে। তারপরও প্রতিমা কয়েকবার এখানে আসিয়াছে; তাঁতের শব্দে, করাত এবং হাতুড়ি-বাটালের শব্দে, কুমোরের চক্রের হিস্‌হিসানিতে, সমবায়-সমিতির সভ্যদের কোলাহলে ইহা জীবন্ত ছিল। হঠাৎ যেন কোথা হইতে একটা কালব্যাধির জীবাণু ইহার ধমনীতে প্রবেশ করিয়া ইহার গায়ের সমস্ত রক্ত-কণিকা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার সকল স্বাস্থ্যদীপ্তি, সকল হাসি, সকল স্ফূর্ত্তি···

'এ কি হচ্ছে! ও রকম হর্ণ বাজাচ্চেন কেন? বন্ধ করুন।' সহসা প্রতিমা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধম্‌কাইয়া উঠিল।

'আমি দুঃখিত। ভুলেই গিছলাম।' কেশব বৈদ্যুতিক ভেরি-টেপা দ্রুত বন্ধ করিয়া সহাস্যেই কহিল, 'এখান দিয়ে গেলেই হাতটা যেন নিশ্‌-পিশ্‌ করতে থাকে···'

'তবে এখান দিয়ে না এলেই চলে।' পরিত্যক্ত গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের জনশূন্য ফটকের দিকে উদাসদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিমা বিরক্তিভরে কহিল। 'কেন আপনারা মিছিমিছি শান্তি নষ্ট করেন, শান্ত পাড়া-গাঁয়ে উৎপাত সৃষ্টি করেন···'

দশ

বেলা আন্দাজ দশটা। নিজের মাটির ঘরের দক্ষিণ-মুখী জানালাটার পাশে ঈজি-চেয়ারে বসিয়া সঞ্জীব ফাঁকা দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া আছে। কাছেই মোড়ায় বসিয়া আছে কবি গণেশ সামন্ত। বিবিধ পাণ্ডুবর্ণ পাণ্ডুলিপি তাহার কোলে ও তাহার চারিপাশে ছড়াইয়া আছে। আন্‌মনা সঞ্জীবকে সে 'অমূল্য' কাব্য পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মুরুব্বির ক্লিষ্ট মুখ ও উদাসদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বড় উৎসাহ বোধ করিতেছে না। কিন্তু গণেশ সামন্তও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়; প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া দুর্গম অঞ্চলের দুরূহ সূত্র হইতে সে যে-সকল কাব্য-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাদের পূর্ণ সম্মান আদায় না করিয়া সে ক্ষান্ত হয় না।

বাউণ্ডুলে মানুষ এই গণেশ সামন্ত। পাঁচালী পাঠ করিয়া, ছড়া বাঁধিয়া, যাত্রা করিয়া, কথকতা করিয়া এই জীবনটা কাটাইয়া দিল। স্ত্রী-পুত্র ছিল; বছর দশেক আগে একবার ওলাউঠার মহামারীতে গ্রামের আরও বহু লোকের সঙ্গে গণেশ সামন্তের পরিবারও নিশ্চিহ্ন হয়। এত বড় সর্ব্বনাশেও গণেশ কিন্তু মুষড়াইল না; অন্তত বাহির হইতে তাহার দার্শনিকতা অটুট মনে হইল। যারাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল তাদেরই সে কহিল: 'কার জিনিষ কে রাখে বল? দেবার মালিক যিনি, নেবার মালিকও তিনিই। এসো, দাদা, একটু তামাক খাওয়া যাক্।' অথচ জগতটাকে নিছক বিভ্রম মনে করিয়াও গণেশ সামন্ত বেশ পরিতৃপ্ত ভাবেই জগতে বিচরণ করিতে পারিতেছে।

বহুক্ষণ ধৈর্য্যভরে অপেক্ষা করিবার পর গণেশ আর নীরবতা রক্ষা করিতে পারিল না। দা'ঠাকুরের এই যাতনা সে গত কয়মাস ধরিয়াই

লক্ষ্য করিয়াছে। নিত্য অনুচর হিসাবে সে ক্ষুণ্ণভাবে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে যে, সমজদার হিসাবে দা'ঠাকুর আর পূর্ব্বের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাহার মত আধ-ক্ষ্যাপা লোককেও দা'ঠাকুরের এই বেদনা পীড়া দিয়াছে। অথচ করিবার কিছু নাই। পলাশডাঙার মাঠে মাটি-কাটা শুরু হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার পর কাপড়-কলে কাজ আরম্ভ হইবার পর হইতে সারা গ্রামের জীবনই তো ওলোট-পালোট হইয়া গিয়াছে। চাষাভূষা এবং বিভিন্ন কারিগরেরা, যাহারা নিত্য সঙ্ঘে আসিত, সঙ্ঘের কাজে সহায়তা করিত, তাহারা বেশি আয়ের স্বাদ পাইয়া কারখানার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে; এমন কি, সঙ্ঘের খোদ সদস্যদের অধিকাংশও নানা অজুহাতে সঙ্ঘের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কাপড়-কল বা কাপড়-কল সম্পর্কীয় ছোটখাট নানা ব্যবসায়ে ভিড়িয়া পড়িয়াছে। প্রথমে কিছু কাল ইহারা মিলের বিপক্ষতা করিয়াছিল, সঙ্ঘের প্রতি নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া সঞ্জীবকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তারপর স্বার্থের মুখে সে সকল সংকল্প কোথায় যে ভাসিয়া গেল। সঙ্ঘেব সমর্থকদের সংখ্যা এখন আঙুলে গোণা যায়।

'আমি বলি কি, দা'ঠাকুর, চলুন ক'দ্দিন ঘুরে আসি।' গণেশ সামন্ত গলা সাফ্ করিয়া, দাড়িতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহিল। 'এ তল্লাটের নানা জায়গায় অমূল্য সব মণি-মাণিক্য পড়ে রয়েচে, কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু জহুরী না হলে তো চলবে না, ছাইপাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। তাই তো বলি, চলুন দা'ঠাকুর, বেরিয়ে পড়ি। যে সব পদ, যে সব গীত হীরে দিয়ে কেনা যায় না, তাই গিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি...'

'সেই অমূল্য জিনিষ দিয়েও যে অনেক কিছুই কেনা যায় না, সামন্তমশাই, সমস্যা তো এই।' এদিকে না চাহিয়া, কিন্তু যথাসম্ভব হাল্‌কা গলায় সঞ্জীব কহিল। 'সাধারণ মানুষের শাক-ভাতেরই যে

ব্যবস্থা করতে পারে না, মণি-মাণিক্যের দিকে নজর দিলে তার চলবে কেন ?…'

'আজ্ঞে, খাওয়া-পরার কথা বলচেন ?' গণেশ সামন্ত না দমিয়া কহিল। 'মানুষ অনাবশ্যক বাহুল্যতায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেচে বৈ তো নয়, নইলে বলুন, আপনিই বলুন দা'ঠাকুর, খেতে পরতে কত সামান্যের দরকার, কত অল্পে মানুষের অভাব মেটে !…আসুন, দা'ঠাকুর, একবার বেরিয়ে পড়া যাক ; যিনি খাওয়াবার মালিক, তিনি আমাদেরও দুটো জুটিয়ে দেবেন। তার জন্যে ভাববেন না।…ঐ, ঐ আবার লোকগুলি জ্বালাতে আসচে। কাব্যের রস বোঝবার যাদের ক্ষমতা নেই, তাদের কে বোঝাবে বলুন ? সঙ্ঘ ছেড়েছিস তো ছেড়েচিস, তবে আবার উত্যক্ত করতে আসা কেন ? এই পদটা শোনাব বলে তৈরি হয়েচি, আর ঠিক সেই সময়েই…'

অসন্তুষ্ট সামন্তমশায়কে বিরক্ত প্রকাশের আর অধিক অবকাশ না দিয়া জনকয়েক লোক 'দা'ঠাকুর' বলিয়া দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ইহাদের পুরোভাগে সঙ্ঘের অন্যতম অকৃত্রিম কর্মী বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর গ্রামের কামার। দা-কাটারি বানাইয়া, লাঙলের ফাল্ তৈয়ারি করিয়া, কাস্তেতে শাণ দিয়া সে প্রায় একচেটিয়া কামারের ব্যবসা চালাইত। মহা উৎসাহী লোক বিশ্বম্ভর ; সঞ্জীব সমবায় সঙ্ঘ গঠন করার পর হইতেই সে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া গ্রামোন্নয়নের কাজে সহায়তা করিতেছে।

বিশ্বম্ভরের পিছনে মার-খাওয়া কুকুরের মতো পিঠ কুঁজো করিয়া তাঁতী পতিতপাবন দাঁড়াইয়া আছে। কলের প্রতিযোগিতায় তাহার ব্যবসা মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই আক্রমণের হাত হইতে কেহ তাহাকে রক্ষা করুক, তাহার চোখে-মুখে এমন একটা আবেদন যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পাশে উদ্বিগ্নমুখে পূব-পাড়ার বুড়ো যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল উপস্থিত।

যজ্ঞেশ্বর সচ্ছল অবস্থার কৃষক; বছর শেষে তিন-চারশো মণ ধান সে গোলায় উঠায়। অথচ বেচারিও যে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না।

'একবার দেখবেন আসুন, দা'ঠাকুর।' সকলের মুখপাত্র হিসাবে বিশ্বম্ভর প্রতিবাদমিশ্রিত কণ্ঠে কহিল। 'একবার বেরিযে দেখে যান, হাড-হাবাতেরা কি রকম দলে দলে সার বেঁধে কলের দিকে চলেচে। যেন মিছিল শুরু হয়েচে। বুক ফুলিয়ে কুলির খাতায নাম লেখাতে ছুটচে। ক'টা নগদ টাকার লোভে লজ্জা-সরম, গাঁয়ের হিত, পাঁচজনের হিত কিছু বিসর্জ্জন দিতেই আটকাচ্চে না। দেখুন দিকি একবার কাণ্ড! মাঠে মাঠে ফসল পেকেছে, এবার না কাটলেই নয, অথচ ঠিক এই সময়টিতেই কলেব বাবুদের কাজ বাড়াবার ঝোঁক পড়ল। দিন-মজুরি চাব আনা করে' বাড়িয়ে দিলে। ব্যস্, আর যাবে কোথায়। যে যেখানে ছিল, 'দুত্তোর' বলে কাস্তে ছুঁড়ে ফেলে চললে কলের দিকে।... একবার দেখুন কাণ্ড! সর্ব্বনাশের কাণ্ড। বলি, গো-মুরুক্ষুবা, কুলি-গিরির পয়সা চিবিয়ে কি পেট ভরবে? ফুলেল তেল, পমেটম পেটে ঘষ্‌লে খিদে দূর্ হবে?...আসুন, দা'ঠাকুর। এই মুরুক্ষুগুলিকে একবাব নিজেদের হিত বুঝিয়ে বলুন...'

'তোমরাই বুঝিয়ে বল! যদি কাজ হয়, তাতেই হবে।' সঞ্জীব শান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল।

'আজ্ঞে, তাতে হবে না।' বিশ্বম্ভর সবিনয়ে কহিল। 'চেষ্টা করে' দেকিনি মনে করেন? গত ছ' মাস ধরে' এদের বোঝাবার কম চেষ্টা করিচি? কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা। যে বুঝেচে মনে হয়, যে রাজি হয়ে যায়, সেও দেকি পরদিন চুপি চুপি কলে গিয়ে নাম লেকাচ্চে। বেশি কি বলব, দা'ঠাকুর, গত হপ্তায় আমাদের পোটো গঙ্গারাম পর্য্যন্ত—নিজ চোকে না দেখলে পেত্যয় হতো না—গঙ্গারাম কুমোর পর্য্যন্ত কারখানায় লেগে গেচে।

ধরা পড়ে যেতেই মুখ কাঁচুমাচু করে' বল্লে: "পেটটা যে পরম শত্তুর, নইলে দা'ঠাকুরের আশ্রম ছেড়ে এই নরককুণ্ডে আসি। কি জানো ভাই, বিশুদা, কারখানার পাশের মনোহারি দোকানগুলিতে বিলিতি পুতুলের আমদানির পর কেউ আর গঙ্গারাম কুমোরের পোড়ামাটির পুতুল ছুঁয়েও দেখে না। পতিতপাবন আগে পাড়ের নক্সা চাইত, তাতে দুচার পয়সা পেতাম। এখন তারই তো শুন্‌চি দুগ্‌গতি চলচে, নক্‌সা কিনবে কে? বুঝলে না, বিশুদা, নিতান্ত বাধ্য হয়েই…" তাকে ধম্‌কে দিয়ে এলাম বটে, দা'ঠাকুর, কিন্তু মুরুক্ষু মানুষ, তার কথার উপযুক্ত জবাবও দিতে পারলুম না। সত্যিই তো, বেচারি এর পর করে কি?…আপনি একবারটি বেরিয়ে আসুন, দা'ঠাকুর। গাঁয়ের লোক আপনাকে মান্যি করে; এদের একটু সুবুদ্ধি দিয়ে সব্বনাশটা বাঁচান, দা'ঠাকুর।' অনুমোদনের জন্য বিশ্বম্ভর তাহার সঙ্গীদের দিকে চাহিল।

'আজ্ঞে, বিশু ঠিকটিই বলেচে, দা'ঠাকুর।' দন্তহীন মুখ খুলিয়া বুড়ো যজ্ঞেশ্বর জড়িত গলায় কহিল। 'চার কুড়ির ওপর বয়েস হলো, এমন নক্‌কীছাড়া কাণ্ড কক্‌কনো দেকিনি। কিষাণের অভাবে আমার পাকা ফসল বুঝি এবার ক্ষেতেই মারা যায়। অতচ গত সনের ডবল মজুরি কব্‌লেচি। বাঁদরগুলো তাতেও কি রাজি হচ্চে। বলচে, তোমার কাজ ক'দিনের? কারখানার কাজ সারা বচর ধরে' চলবে।…কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে' যায়। বাপের বয়সে এমন কথা শুনিনি…'

'এরা আত্মহত্যে করতে বসেচে, দা'ঠাকুর।' বিশ্বম্ভর সোদ্বেগে কহিল। 'আপনি এসে একবার ভালো করে' বুঝিয়ে বলুন। এদের বাঁচান। আপনার কথা ওরা ফেলতে পারবে না…'

সঞ্জীব ক্ষণকাল নিঃশব্দে ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জবাব দিবার শক্তি পাইতেছে না। অতঃপর চেষ্টা করিয়া কহিল, 'তাতে কিছু কাজ হবে না, বিশ্বম্ভর।'

'আপনিও যদি একথা বলেন, তবে আর রইল কি, দা'ঠাকুর?' বিশ্বম্ভর যেন একটা ধাক্কা সামলাইয়া কহিল।

'আজ্ঞে, দা'ঠাকুর, মরে' গেলাম যে।' এতক্ষণ পরে তাঁতী পতিত-পাবন প্রথম কথা কহিল। 'যত ব্যাটা তাঁতী, সবাই কলে ঢুকে পড়েচে। সমবায় করে' না যায় স্থতো কেনা, না যায় কাপড় বেচা। এই মাগ্‌গির বাজারেও আমার খদ্দের জোটে না। যারা কিনতো, সব্বাই এখন কলের মজুর; কল থেকেই তারা কাপড় পাচ্চে। আমি ব্যাটা যে না খেয়ে মরচি, দা'ঠাকুর, তা কে দেখচে। একটা বিহিত বলে' দিন, দা'ঠাকুর, আর যে পারিনে…'

'উপায় নেই, পতিতপাবন,' সঞ্জীব প্রায় অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল। 'তোমাকেও কলে যোগ দিতে হবে। এ একবার শুরু হলে কেউ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি…কি ব্যাপার, স্কুলের ছেলেরা এত হল্লা করচে কেন? চল তো, চল তো দেখি একবার, কি হলো।' বলিয়া সঞ্জীব উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইস্কুলবাড়িতে একটা হল্লা উঠিয়াছে। সব ছেলেই যেন একযোগে চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে। এ শব্দ যেমন বিরাট, তেমনি অভূতপূর্ব্ব। ইস্কুলের কম্পাউণ্ডে বহু ছেলে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। ইহাদের কথাবার্ত্তায়, হাত নাড়ায়, মুখ নাড়ায় মহা উত্তেজনার ভাব। সময়ের কিছু আগে ইস্কুল ছুটি হওয়া এমন কিছু অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যাহার জন্য এতখানি উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। দলে দলে শিশু লাফাইতে লাফাইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ ইস্কুলবাড়িকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, কেহ কাঠের ফটকের উপর দমাদম লাথি মারিতেছে। সকলেই যেন ক্ষেপিয়া

উঠিয়াছে। যেন একপাল ভিমরুল চাকের উপর হইতে উঠিয়া সহসা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে।

সঞ্জীব ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ইহাদের সম্মুখীন হইল। যে ছেলেটি একদিন তাহাকে জমিদারের মোটর-গাড়ির দাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহাকে সামনে পাইয়া কহিল, 'তোরা এমন চেঁচামেচি করচিস কেন? হয়েচে কি? ইস্কুল ছুটি হলে কি এমন করে' লাফালাফি করতে হয়। কে তোদের আধঘণ্টা আগে ছুটি দিলে?'

'আমরা আর তোমার ইস্কুলে পড়ব না, দা'ঠাকুর।' বালকটি প্রথমে একটু থতমত খাইয়া পরক্ষণেই সগর্ব্বে ঘোষণা করিল। 'আমরা সব কারখানার নতুন ইস্কুলে পড়তে যাচ্চি। সেখানে পড়লে কারখানাতেই আমরা চাকরি পাব। কল চালাতে শিখব। তোমার এখানে পড়ে আমাদের কি হবে? কিচ্ছু লাভ হবে না, কি বলিস্, গোব্‌রা?…'

ইতিমধ্যে ছেলের দল তাহাদের বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভিড়ের মধ্য হইতে গোব্‌রা তাহার বন্ধুকে সমর্থন করিয়া কহিল, 'হবেই না তো। সারা জন্ম চাষাভূষো হয়ে থাকতে হবে। আমরা কেন চাষা হয়ে থাকব? তাই তো তোমার ইস্কুল ছেড়ে যাচ্চি, দা'ঠাকুর…'

'সে-সে-সে ইস্কুলে বে-বে-বেঞ্চি আছে।' মধু নাপিতের তোত্‌লা ছেলেটা পিছন হইতে গলা উঁচু করিয়া কহিল। 'আ-আমরা বে-বে-বেঞ্চিতে বসব…'

ইহাদের পিছনে পিছনে হেড্‌মাস্টার ত্রৈলোক্যবাবু ডুবন্ত জাহাজের কাপ্তানের মতো অসহায় মুখে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সঞ্জীব তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'কি ব্যাপার, ত্রৈলোক্যবাবু? এরা হঠাৎ সব পালিয়ে যাচ্ছে কেন?'

'আর বলেন কেন, স্যার।' ত্রৈলোক্যবাবু হতাশা-মিশ্রিত কণ্ঠে জানাইলেন। 'ফ্যাক্টরি-ম্যানেজার কারখানার কর্ম্মচারিদের হুকুম দিয়েচেন,

প্রত্যেকের ছেলেপিলেকেই কারখানার ইস্কুলে ভর্ত্তি করাতে হবে, নইলে চাকরি যাবে। তারই ফল এই। চাকরি খোয়াবার কারুর সাহস নেই; তাই ছেলেদের এখান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।···সেখানে নাকি বেশি কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হবে। ছেলেপিলেদেরও কারখানায় চাকরি দেওয়া হবে···যেতে দিন্, স্যার। গাধা-গরু ঠেঙিয়ে আমাদের কি আর লাভ হচ্ছিল। যাদের কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই···কুড়ি-পঁচিশ টাকা পেতাম, তা অন্য কোনও উপায়ে জোগাড় হয়ে যাবে···'

ধূসর অপরাহ্নে নির্ব্বাক সঞ্জীবের সাথী হিসাবে তখনও গণেশ সামন্ত বসিয়া আছে। দুজনের কাহারও খাওয়া হয় নাই। কেষ্টর মা বহু বকর-বকর করিয়াছে, কিন্তু ডেক-চেয়ারটা হইতে উঠিবার মতোও যেন সঞ্জীবের শক্তি ছিল না। একটা অসম্ভব অবসাদে তাহার দেহ এবং মন পূর্ণ হইয়াছে।

'আমার কথা শুনুন, দা'ঠাকুর। চলুন, বেরিয়ে পড়ি।' গণেশ সামন্ত আবার তাহার প্রস্তাবটা জানাইল। 'পৃথিবীর একটা কোণায় কেন মিছিমিছি চিরটা কাল বদ্ধ থাকবেন। মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে আছে চার-দিকে, কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা···আপনি বৈরিগি মানুষ, কেন বারবার জড়িয়ে পড়েন? কেউ চরকা চালাবে, কি মিল চালাবে, এতে আপনার মুখ্ডোলে তো চলবে না। সে মুখ্ডোবে তারা, যারা ঐদিকে মন বেঁধে রেখেচে। কিন্তু যে ধন বাইরের নয়, যে ধন অন্তরের, আপনি যে তার সমজদার! তবে আর ভয়টা কি? তবে আর কষ্ট কিসের? তবে আর··'

'এবার বোধহয় আপনার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তে হবে।' এতক্ষণ পরে সঞ্জীব প্রথম সামন্তমশায়ের কথার জবাব দিল। 'আর তো করার কিছু নেই।'

'বড় খুসি করলেন, দা'ঠাকুর, বড় খুসি করলেন।' সামন্ত-মশায় আনন্দে দুই পাটি দাঁতই বিকশিত করিয়া কহিলেন। 'আপনার মতো

মহাপুরুষের কাছে এই তো চেয়েছিলাম। তবে আর দেরি নয়। কিসের বন্ধন আমাদের ? চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আজই 'দুগ্‌গা' বলে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে হুগলী জেলাটাই ধরা যাক। যেখানে যা রত্ন আছে,খুঁজে বের করি। আপনি পাকা জহুরী সঙ্গে আছেন, আর ভাবনা কি ? কাঁচ দেখে ভুলব না। খাঁটি রত্ন আবিষ্কার করে' তবে ছাড়ব। ছড়া, পদ, কড়চায় ঝুলি ভরে' উঠবে।...তারপর, সারা পৃথিবীই পড়ে আচে সামনে। হেঁটে এগিয়ে গেলেই হলো।...একবার যখন মনস্থির করেচেন, তখন আর মিছিমিছি দেরি করা চলবে না, দা'ঠাকুর। আজ শুভ ত্রয়োদশী, আজ যাত্রা শুভ !...ও কেষ্টর মা, শুনচ ? আজ আমিও এখানে দা'ঠাকুরের দুটো পেসাদ পাব। সন্দের আগেই আমাদের চারটি দিয়ে দাও। ও কেষ্টর মা...'

'কেষ্টর মা মরেচে।' কেষ্টর মা রান্নাঘর হইতে হাঁকিয়া জানাইল।

এগারো

বিনিদ্র দুই চোখ সুদূর মাঠ ও দিকচক্রেরেখার দিকে মেলিয়া প্রতিমা তার শয়ন-ঘরের বড়ো জানালাটার পাশে বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জোর করিয়া সে ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। যেন একটা অপরাধী বিবেক তাহাকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; নিজের দোষ বার বার অস্বীকার করিয়াও ইহার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইতেছে না।

প্রতিমা এখনও মনে করে যে, এই অর্থহীন নিষ্ফল পথে চলিতে চাওয়া সঞ্জীবের একটা বাতিক ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার এই একগুঁয়েমি দূর করিবার জন্য একদা প্রতিমা তাহার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল। সঞ্জীব সে প্রার্থনা অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অভিযোগের কারণ প্রতিমার নিশ্চয়ই আছে; অন্তত অভিমানের তো বটেই। কিন্তু আজ দুপুরে বাড়ি ফিরিবার পথে সঞ্জীবের জন-পরিত্যক্ত আশ্রমের নির্জ্জীব চেহারাটা দেখিবার পর তাহার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। শত হোক, সঞ্জীবের একগুঁয়েমির জবাবে প্রতিমা উদ্যোগী হইয়া তাহার জন্য কম বড় শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। তাহার ক'বৎসরের সাধনা তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে, শক্তিশালী দুষ্টু ছেলে যেমন তাহার দুর্ব্বল সঙ্গীর খেল্‌না চুরমার করিয়া দেয়। 'কেন, কেন আমি এতে উদ্যোগী হলাম? কেন কারখানা প্রতিষ্ঠায় আমি অংশ গ্রহণ করতে গেলাম?' অনুশোচনার সঙ্গে অপ্রবুদ্ধ প্রতিমা বার বার নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সারা হইল। সঞ্জীবের বাতিক আছে বলিয়া প্রতিমা তাকে শাস্তি দিবার কে?

পরদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিতে প্রতিমার বিলম্ব হইল। সারা রাত ছটফট করিয়া বিনিদ্র কাটাইয়া মাত্র ভোরের দিকে সে ঘুমাইয়াছিল। চোখ মেলিয়া জানালা দিয়া রৌদ্রের প্রখরতা তার নজরে পড়িল। ড্রেসিং-টেবিলের টাইম্‌পিসে ঘণ্টার কাঁটা সওয়া আটটারও ওদিকে। প্রতিমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। সাড়ে আটটায় কেশব প্রাতরাশে বসে। তার আর বড়ো বাকি নাই।

গোসলখানায় গিয়া হাতে মুখে জল দিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইয়া ও চুল আঁচড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া ঈষৎ লজ্জিত ভাবেই প্রতিমা খানা-কামরায় গেল। দরজার মুখে বেয়ারা জানাইল যে, মহিম খুব ভোরেই বাহির হইয়া গেছে এবং সে পায়ে হাঁটিয়াই গিয়াছে। 'তবে বেড়াতে গিয়েচে।' বলিয়া প্রতিমা টেবিলের দিকে আগাইয়া গেল।

এদিকে পিঠ করিয়া, ফলের ট্রে-র উপর একটা ব্লু-প্রিণ্ট মেলিয়া কেশব অভিনিবেশ সহকারে সেটা পরীক্ষা করিতেছিল, চটির শব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিল। সহাস্যে কহিল, 'আমি ভাবলাম, আজ বুঝি উপবাসী হয়েই কারখানায় রওনা হ'তে হয়। অন্নপূর্ণা যখন অনুপস্থিত তখন অন্ন কে দেবে?…এ কি? দু'চোখই যে বেজায় লাল! রাতে ঘুম হয় নি বুঝি?…'

'না, ভালো ঘুম হয় নি… রামু, বাঃ, তুমি এখনও ডিম-সেদ্ধ এনে দাও নি।' প্রতিমা গম্ভীরভাবে চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে কহিল। 'আপনার কি দেরি হয়ে গেল। আমার উঠতে ভারি দেরি হয়েচে।… আমাদের বাড়ির ঝিগুলোও হয়েচে এমন, বেলা দেখে কেউ যদি একবার ডেকে দেবে!…'

'আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্চেন,' কেশব ব্যস্ত হইয়া কহিল। 'সত্যিসত্যি কি আর আমি না খেয়েই কাজে যেতাম। হাঁকডাক করে একটা ব্যবস্থা করে' নিতামই। আমি কি আর এতদিনেও ঘরের লোক হয়ে উঠিনি। তবে কি জানেন, কেউ যদি, আপনার মতো কেউ যদি কাছে বসে

খাদ্য-পরিবেশন করে, তবে খাওয়ার স্বাদ চারগুণ বেড়ে যায়। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্টার্চ, ফ্যাট্‌ মিলিয়ে যে খাদ্য…'

'ওটা অতিথির প্রাপ্য। ওটা এমন কিছু নয়।' বলিয়া প্রতিমা ছুরি দিয়া টোস্টের পোড়া অংশ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

'অথচ এরই জন্যে আলাদা জায়গায় গিয়ে থাকার কথা নিয়ে জোর করতে পারছি নে। মহিমদার আদেশই শিরোধার্য্য করে' নিতে হচ্ছে।' কাগজ গুটাইয়া কেশব খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে কহিল, 'মহিমদা কোথায় বেরিয়েচেন বলতে পারেন? তার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার ছিল, অথচ…'

'সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংগ্রহে বেরিয়েচেন।' প্রতিমা গম্ভীর ভাবেই কহিল।

'মহিমদা! স্বাস্থ্য-সংগ্রহে! অসম্ভব।' কেশব সহাস্যে কহিল। 'কিন্তু আমার অপেক্ষা করা চলবে না। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনি কারখানায় যাবেন কি? চলুন না, খানিকটা আপনার সোফার-গিরি করি…'

'এখন থাক।'

কেশব বাহির হইয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ প্রতিমা মহিমের জন্য অপেক্ষা করিল। কিন্তু তাহার ফেরার কোনও স্থিরতা নাই। প্রাতরাশ করিতে প্রায়ই তার বেলা হয়। প্রতিমা এক কাপ চা ঢালিয়া পান করিল, এবং রামু বেয়ারাকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া খানা-কাম্‌রার বাহিরে আসিল। সমুখে যে চাকরটাকে পাইল তাহাকে দিয়া ড্রাইভার রামলগনকে গাড়ি বাহির করিবার আদেশ পাঠাইল, এবং গাড়ি বাহির হইলে নিচে নামিয়া আসিয়া জানাইল সে একাই গাড়ি লইয়া বাহির হইবে, রামলগনের আসিবার দরকার নাই।

প্রায় চোরের মতো পা টিপিয়া টিপিয়া, দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড মোটর অতিশয় নিঃশব্দে গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের ভাঙা ফটকের সামনে আসিয়া থামিল। যেন আশ্রমের নৈঃশব্দ্য না ভাঙিতে আগে হইতে তাকে বিশেষ হুঁসিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গাড়ি থামিলে এই আদেশের কর্ত্রীও অতিশয় নিঃশব্দে কম্পিত পায়ে এবং দ্রুত-স্পন্দিত বুকে নিচে নামিল। প্রায় ন' দশ মাসের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিমা সঞ্জীবকে দেখিতে আসিয়াছে।

জনশূন্য অনাদৃত চালাঘরের সারির মধ্য দিয়া প্রতিমা প্রায় পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল। তাহার আগমনের সংবাদ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপন রাখিয়া নাটকের দৃশ্যের মতো একেবারে অকস্মাৎ প্রকাশ করা যায় না কি? এতদিন অপেক্ষার পর যেন একটা নাটকীয় মিলনের উপর দাবি জন্মাইয়াছে। প্রতিমার শিরা-উপশিরায় সাড়া পড়িয়া গেল। দীর্ঘ অদর্শনের পর এমন কিছু একটা নাটকীয় পরিসমাপ্তি হোক, যাহাতে জীবনের মোড় বদলাইয়া যায়, না-বলা অস্বস্তির অবসান ঘটে।

'সঞ্জীববাবু কোথায়?' ঘরের দরজার তালার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা অসন্তুষ্ট-মুখ কেষ্টর মাকে প্রতিমা সভয়ে প্রশ্ন করিল।

বাক্‌পটিয়সী কেষ্টর মা পাঁচ সেকেণ্ড কাল ইহার কোনও জবাব না দিয়া অনাত্মীয়তা প্রকাশ করিবার পর সংক্ষেপে কহিল, 'নেই।'

'কোথায় গেছেন?' প্রতিমা যেন গলা দিয়া যথেষ্ট শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

'কে জানে, কোথায় গেছে।' কেষ্টর মা গাম্ভীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া কহিল। 'ভগবান জানেন, আর জানে সেই মুখপোড়া ছড়া-ওলা। সেই হাড়-হাবাতের সল্লায় দা'ঠাকুর ভুলে গেলেন! মায়া নেই, মমতা নেই, বাপ-পিতামোর ভিটের ওপর একটু টান পর্য্যন্ত নেই। এক পহর রেতে

এসে বল্লে, "শুনছ কেষ্টার মা, আমি কিছুদিনের জন্যে গাঁয়ের বাইরে চল্লু। তুমি থেকো এখেনে। ঘরটার ওপর নজর রেখো। চাল ডাল যা আছে, তোমার দু-দশ মাস কুলিয়ে যাবে। আর এই ধরো পঁচিশ টাকা। দরকার মতো খরচা করো। আমি বল্লু, "কোতা যাচ্ছ, কবে ফিরচ সব বলে যাও, দা'ঠাকুর।" তা সে কি বল্লে জানো? বল্লে, "তা কি আমিই জানি? একেবারে নাও তো ফিরতে পারি।" শুনলে, শুনলে একবার কথার ছিরি! এমন কথা শুনলে কার না গায়ের অক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু তা হলেই বা আর কি করচ। যা সে বলবে, তা সে করবেই। চন্দ্রসূয্যি ছিট্‌কে পড়বে, তবু তাঁর কথার নড়চড় হবে না। দেখলে, একবার কাণ্ডটা দেখলে! আগ ধরে' যায়! মনে হয়, দুত্তোর বলে যেদিকে চোক যায় বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তার উপায় নেই। দা'ঠাকুরের কতা যে দেবতার আদেশ। তাই বসে আচি। তার ঘর-দোর আগলে গোড়খানার ভূতের মতো বসে আচি...'

'আর কি তিনি কিছু বলে গেছেন?' প্রতিমা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কহিল।

'বলে গেচেন কি গো, কাজ দিয়ে গেচেন! দু কুড়ি দশ টাকা। পতিতপাবন তাঁতীকে পৌচে দিতে হবে। তার নাকি বড় দুদ্দশা যাচ্ছে, তাই তাকে টাকা পৌচে দেওয়া চাই। পাছে ভুলে যাই, তাই যাচ্ছেন, আব ফিরে ফিরে বার বার বলছেন: "আবার ভুলে যেয়ো না, কেষ্টর মা। কালই তাদের হাতে পৌছান চাই। আমাকে ত্যাগ করেনি বলেই তাদের এ কষ্ট।" শুনলে একবার কতাটা! যত গণ্ডার যত দুখ্‌খু সবারই দায় কিনা তোমার! দিয়ে আসব'খন। আর দা'ঠাকুর যা বুল্লুতে বলেচেন, তাও বলে আসব।...দু'পা গিয়ে আবার দা'ঠাকুর ফিরে এলেন। বল্লেন, "আর অমনি ওকে বলো, কেষ্টর মা, কলেই যেন কাজ নেয়, নইলে কলের মার খেয়েই ওকে মরতে হবে।"...কি লক্ষ্মীছাড়া কলই

গাঁয়ে এলো, দিদিমণি। এই পোড়ার কলের জন্যেই দা'ঠাকুরের এমন জমজমাট জায়গা ছত্রছান হয়ে গেল।··বুঝবি, ড্যাকরারা, এর ফল টের পাবি। আখেরে আফশোষ করে' মরতে হবে। কে শত্তুর আর কে আপনার জন চিন্‌লি নে, কাঁচা পয়সার লোভে কলের কুলি হ'তে ছুটলি। ভগমান আচেন, এখনও চন্দ্রসূয্যি ওটে···'

মাটির আধ-ভাঙা সিঁড়ি দিয়া প্রতিমা কুটিরের বারান্দায় উঠিয়া আসিল। রুদ্ধ দরজার কাছে কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দরজার কাঠে গঙ্গারামের আঁকা ময়ূর কদমগাছের কুসুমিত ডালে পেখম ছড়াইয়া বসিয়া আছে। প্রতিমা নিজ চোখে দেখিয়াছে, এই গঙ্গারাম এখন মিলে কাজ করে। খেল্‌না তৈরি করে না, ছবি আর আঁকে না, বসিয়া বসিয়া টবে রং গোলে। আর পাঁচটা মজুরের মতোই মজুর।

দরজার উপর দুই হাত ছোঁয়াইয়া প্রতিমা কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজিয়া রহিল। তারপর আর কোনও দিকে না চাহিয়া দ্রুত স্খলিত পদে ছুটিয়া সে নিজের গাড়িতে আসিয়া উঠিল। অনুতাপ হইতে লাগিল, কেন বামলগনকে সঙ্গে আনে নাই। না আছে প্রতিমার মাথার ঠিক, না আছে চোখের দৃষ্টি এবং হাতের জোর অব্যাহত। কাল যখন এই আশ্রমের সম্মুখ দিয়া কেশব তাহাকে বিজয়ীর শিঙা বাজাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন প্রতিমা কল্পনাও করে নাই যে, সে-রাত্রেই তাহাদের বিজয় স্বীকার করিয়া সঞ্জীব গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছে। হায়, জয়-পরাজয়!

'কেন কাল এলাম না, কেন একদিন দেরি করলাম।' ঝাপ্‌সা চোখ মার্জ্জনা করিতে করিতে প্রতিমা বাড়ির দিকে গাড়ি হাঁকাইল।

বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কিন্তু প্রতিমা নিজের উপর দখল ফিরিয়া পাইল। সে নিজেকে কেবলই বুঝাইতে লাগিল: 'আমরা এমন কিছু

অন্যায় করিনি, যার জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে! এমন কোনও শত্রুতা করিনি, যার জন্য লজ্জিত হ'তে হবে। সে যদি এত সহজে ছাড়তে পারে, আমরাই কি পারব না?'

বাড়ির সামনের সিঁড়ির মাথায়ই মহিম দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিমা গাড়ি হইতে নামা মাত্র সে উপর হইতে চেঁচাইয়া কহিল, 'কোথায় গিয়েছিলি? আমি ফিরে এসে তোর খোঁজ করছি। বড় দুঃসংবাদ! কাল রাত্রে সঞ্জীব গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। কে একটা বাউল তাকে দলে টেনে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সে প্রায় কিছুই নিয়ে যায়নি; একবারে খালি হাতেই বেরিয়ে পড়েচে! কি সর্ব্বনাশ! শেষে আমরাই কি সঞ্জীবকে ঘর-ছাড়া, দেশ-ছাড়া করে' ছাড়লাম!...' মহিমের কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

'আমরা কেন ঘর-ছাড়া করব, দাদা।' প্রতিমা স্পষ্ট গলায় কহিল। 'আমরা তাকে দলে নিতেই চেয়েছিলাম। তিনিই আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেচেন।'

'আমাদেরও কি দোষ নেই, প্রতিমা?' মহিম ভগ্নীর মুখটার দিকে ঈষৎ বিস্মিতভাবে চাহিয়া কহিল। 'সেই মতভেদের পর থেকে তার সঙ্গে আমরা আর কোনও সম্পর্কই রাখিনি; একদিন ডেকেও তাকে জিজ্ঞেস করিনি...'

'তিনিও করেন নি।' প্রতিমা অকম্পিত কণ্ঠে কহিল। 'দায়িত্ব আমাদের একলার নয়।...এসো দাদা, খাবে এসো। আমার খিদে পেয়েচে...'

বারো

গণেশ সামন্তের নেতৃত্বে ক'টা মাস ভবঘুরে বাউলের মতো গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটিয়া গেল। প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটা সঞ্জীবের কাছে স্বপ্নের মতো অবাস্তব ও সার্থকতাবিহীন মনে হইয়াছিল। হারানো এবং অবজ্ঞাত কাব্য সংগ্রহের যে দুর্নির্বোধ্য প্রেরণা সামন্ত-মশায়কে দিশাহারা করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে টানিয়া লইতেছে, সঞ্জীব নিজের মধ্যে সে-প্রেরণা অনুভব করে না। সে কাব্য-রসিক হইলেও কাব্য-পাগল নয়। গণেশ সামন্তকে যাহা তৃপ্ত করিতে পারে, শুধু তাহাতে সে তৃপ্ত হইতে পারে না। এই যাযাবর-বৃত্তির স্বপক্ষে বলিবার মতো তাহার আরও কিছু চাই।

এক প্রকাণ্ড আঘাত খাইয়াই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বেদনাটাই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল, বিচার-বোধ হইয়া উঠিয়াছিল গৌণ। কিন্তু যুক্তি যতই স্বাধিকার লাভ করিতে লাগিল, ততই সঞ্জীব গণেশ সামন্তের সাথে এই অদ্ভুত পরিক্রমার সার্থকতায় সন্দিহান হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সামন্ত মশায় নাছোড়বান্দা লোক, সঞ্জীবকে সঙ্গী হিসাবে পাইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। এক গ্রাম ছাড়িয়া আর এক গ্রামে হাজির হইতেছে। দেবমন্দিরে ঘুরিতেছে, আখ্‌ড়ায় হানা দিতেছে, গ্রামবৃদ্ধদের জেরা করিয়া তাহাদের জীবন অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। কোথায় কার পিতামহ কি ছড়া বাঁধিয়াছিলেন, বিশালাক্ষীর কোন্ মন্দিরের কোন্ পুরোহিত কি গান রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ বৈরাগী কোন্ শিষ্যকে বাউল-সঙ্গীতের কোন্ অমূল্য রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন, এই খোঁজগুলি তাহার কাছে বিজ্ঞান-সাধনার মতোই

গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। এই অনুসন্ধানে সে জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। যে-কোনও পুরাতন পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলেই সে সঞ্জীবের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করিয়া বলে: 'দেখলেন, দেখলেন দা'ঠাকুর। দেখলেন তো? ছড়িয়ে আচে, বনে-জঙ্গলে, ভাঙা দেউলে-দর্গায় মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে আচে, শুধু জহুরী চাই, দেকে চিনে নেবার মতো জহুরী চাই...'

সামন্তের হাত হইতে ছাড়ান পাইবার উপায় ছিল না, সঞ্জীবের সে উৎসাহও ছিল না। প্রায় নির্ব্বাক সঙ্গী হিসাবেই যে গণেশ সামন্তকে অনুসরণ করিয়াছে। ক্রমে এই অর্থহীন ভূমিকার মধ্যে সে একটা নতুন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। মন্দ কি, যদি বাংলাদেশের অজানা গ্রামগুলির সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এমন করিয়া পরিচয়হীন গ্রাম হইতে পরিচয়হীন গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো বোধহয় কোনও দিনই ঘটিয়া উঠিত না; গণেশ সামন্তের কল্যাণে যদি তাহা সম্ভব হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে উভয়ের উদ্দেশ্যের একতার অভাব আছে বলিয়াই কি আক্ষেপের কোনও অর্থ হয়?

অকস্মাৎ এই অর্থহীন পরিক্রমা সঞ্জীবের কাছে সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে, তখন তাহা দুই হাতে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে যে অযুত মানুষ বাস করে তাহাদের সহিত এবং তাহাদের অভাব ও আনন্দের সহিত আমাদের পরিচয় কত ক্ষীণ! কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র রীতি, কত বিচিত্র উৎসব ও অনুষ্ঠান, কত বিচিত্র অভাব-অভিযোগ এই গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া আছে। বই পড়িয়া ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, চন্দ্রলোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের চেয়ে তা বেশি নয়। ইহাদের নিকট-সান্নিধ্যে আসিলে তবে বুঝিতে পারি, দারিদ্র্য কত অসংখ্য লোকের জীবন ব্যর্থ করিতেছে, অশিক্ষায় কত সহস্র লোকের রুচি এবং রীতি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, অস্বাস্থ্য কত জীবন পঙ্গু করিয়াছে। অথচ

কত প্রাণ-শক্তি, কত সারল্য-সহানুভূতি, সুখী হইবার জন্য, বাঁচিবার জন্য কত আগ্রহ! ইহাদের এত কাছে আসিয়া না দাঁড়াইলে এত কিছু চোখেই পড়িতনা। দেশ-শাসকদের পক্ষে বৎসরের কিয়দংশ গ্রামে বাস আবশ্যিক হইলে আইনের ও শাসনের ধারা বদ্‌লাইয়া যাইত, সঞ্জীব মনে মনে ভাবে।

নির্জ্জীব গ্রামগুলির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সঞ্জীবও নিজস্ব কতগুলি সংস্কারের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিল। নৈস্তব্ধ্য যতই শান্তিপ্রদ হোক, এমন নিস্তব্ধতা কাম্য নয়; শব্দ ও চাঞ্চল্য জীবন হইতে মৃত্যুর তফাৎ সূচনা করে। প্রতিমা একদিন বলিয়াছিল: 'গ্রামকে বাসযোগ্য করার পক্ষে প্রথমেই কি করা দরকার জানেন? একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।' অন্তত আর একটু চেঁচামেচির ব্যবস্থা করা যে দরকার, তা অস্বীকার করা চলেনা—তা সে পূজা-পার্ব্বণ দিয়াই হোক, খেলাধূলা দিয়াই হোক বা রেডিয়ো লাউড-স্পীকারের প্রবর্ত্তন করিয়াই হোক। লোকে যেন মনে করিতে পারে, জীবিত লোকের মাঝে বাঁচিয়া আছে; মড়ার দেশে মরিয়া নাই।

সঞ্জীব আরও ভাবে, সম্ভবত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ আনাও একান্ত আবশ্যক। একে তো বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় ছোটখাট যন্ত্রপাতি ঘরে বসিয়াই চালানো যায়, তার উপর আছে বিদ্যুতের জীবনের মেয়াদ বাড়াইবার আশ্চর্য্য শক্তি। অন্ধকারের অবলুপ্তি দূর করিয়া বিদ্যুৎ-আলো মানুষের কাছে কতগুলি বাড়্‌তি ঘণ্টা সংগ্রহ করিয়া আনে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মুখেই লেলিন এই জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা অতখানি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।

অথচ, সঞ্জীব একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়াই ভাবে, দশার্ণপুরে মিল-প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসাবে বৈদ্যুতিক বাতির আমদানি এবং তাহার ফলে গ্রামের কোমল অন্ধকার অন্তর্দ্ধান করিবে, এই আশঙ্কায় সে রীতিমত

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তর্ক করিয়াছিল। তবে কি সে সামন্ত মশায়ের মতোই কবি! কাব্য এবং কোমলত্ব ছাড়া আর কিছুকেই মূল্য দেয় না? তাহার সমস্ত পরিকল্পনাই কি অবাস্তব আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত? দেশবাসীর অশিক্ষা দূর করিতে হইলে, জীবনযাত্রার মান এবং জীবনের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি করা চাই। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এই ধন কোথা হইতে আসিবে? কৃষির উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। প্রকৃতির সম্পদ সব চেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারা কোনও দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে না। কাঁচা মাল হইতে পণ্য উৎপাদন করা চাই। কৃষির উন্নতির জন্যও কৃষি-যন্ত্র উৎপাদন করা চাই। কুটির-শিল্প যে হারে পণ্য উৎপাদন করে তাহাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে সারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয় না। কলকারখানাকে কি আধুনিক কালের জীবনযাত্রা হইতে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব? ইহার ত্রুটি-কদর্য্যতার ভয়ে ইহাকে কি দূরে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে? তাহার সকল অর্থনৈতিক চিন্তাধারা তাহার চাকরি-জীবনের সেই গুলি-চালানোর আদেশের ফল নয় তো! সঞ্জীব শিহরিয়া ওঠে। তাহার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি এলো-মেলো হইয়া যায়।

চৈত্রের মাঝামাঝি। বসন্তের স্পর্শে মরা গ্রামগুলি যেন যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে। গাছপালায় নানা রকম রং দেখা দিয়াছে; অদৃশ্য স্থান হইতে নানা সুগন্ধ নাকে আসিয়া প্রবেশ করে।

স-সঙ্গী সঞ্জীব তখন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে শ্রীকল্যাণ নামক গাঁয়ে শ্রীমন্ত ঘোষের বাড়িতে অতিথি। শ্রীমন্ত জাতে গোয়াল। গোয়ালে পাঁচসাতটা গাই প্রচুর দুধ দেয়। সেই দুধে দই-ক্ষীর মাখন এবং ঘি তৈয়ারি হইয়া আশেপাশের দুপাঁচখানা গ্রামে

বিক্রি হয়। পূর্ব্বে এই কাজে শ্রীমন্তের একমাত্র পুত্র হারাধন বাপের সাহায্য করিত। এখন সে পলাতক। এক রাত্রে ঘুমন্ত বালিকা স্ত্রীকে সিদ্ধার্থের মতো গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া সে নিরুদ্দেশ হয়। শ্রীমন্ত গ্রামে প্রচার করিয়াছে, ভালো চাকরি পাইয়াই পুত্র বিদেশে গমন করিয়াছে। কিন্তু গ্রামে নিন্দুকের অভাব নাই; শ্রীমন্তের এমন একটা যুক্তিযুক্ত কৈফিয়তে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন না করিয়া তাহারা গাঁয়েতে এমন গুজব পর্য্যন্ত রটাইয়াছে যে, পুত্রবধূর উপর তাহার মাতৃদেবীর অতি-সদয় ব্যবহারে বীতস্পৃহ হইয়াই হারাধন গৃহত্যাগ করিয়াছে।

কারণটা যে একেবারে অলীক নয়, তাহা সঞ্জীব এখানে একটা সপ্তাহ বাসের ফলেই টের পাইয়াছে। গত কয়মাসে বহু লোকের আতিথ্যই তাহাদের গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতিথি দেবতা, এই সনাতন বিশ্বাসে অনেকেই খাতির করিয়া জায়গা দিয়াছে। তবে যাহারা তাহাদের কোন কাজে খাটাইয়া তাহার বিনিময়ে খাওয়া ও আশ্রয় দিত, সঞ্জীব তাহাদের কাছে থাকাই পছন্দ করিত। গণেশ সামন্ত কবি ও দার্শনিক মানুষ; খাদ্য সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করার সে পক্ষপাতী ছিল না। খাটিতে তার কষ্ট বা অপমান কোনটাই ছিল না, কিন্তু অমূল্য সময় যে অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে নষ্ট হইতেছে, ইহাই ছিল বড় আক্ষেপ।

গোপ-মহাশয়ের তৈল-চিক্কণ দেহ এবং বাড়ি-ঘরে সচ্ছলতার ছাপ দেখিয়া সে বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে যে অন্তত পক্ষকাল দেবতার সম্মানে কাটাইয়া গ্রামের মনসাতলা এবং গ্রামান্তরের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আখ্‌ড়াটি হইতে সকল মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করিতে পারিবে ইহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। কিন্তু এবারও সঞ্জীব সুখে বাদ সাধিল। সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্তের কাছে তাহার ঘি-দৈ ফেরি করিবার প্রস্তাব করিল। শুনিয়া সামন্তমশায় তো স্তম্ভিত! যে লোকটা কদিন আগেও

একটা জলজ্যান্ত হাকিম ছিল, সেই কিনা কাঁধে বাঁক লইয়া দই ফেরি করিতে চায় !

শ্রীমন্ত ঘোষ বিনয় করিয়া কহিল, 'আপনারা তো আগে খান-জিরোন। কাজ যদি করতে চান, তবে কাজের অভাব কি ?'

'কিন্তু এ কাজ কি আপনার যুগ্যি কাজ, দা'ঠাকুর। এ পারি আমি।' গণেশ সামন্ত অসন্তুষ্ট প্রতিবাদ করিল।

'কোনও কাজই ছোট নয়, সামন্ত মশায়। কোনও কাজই মানুষের অসাধ্য নয়।' বলিয়া সঞ্জীব পিঠের কাপড়ের ব্যাগটা নামাইয়া রাখিল।

কাজের অবশ্য অভাব হইল না, তবে ঘৃতের ভাণ্ড অচেনা লোকের হাতে তুলিয়া দিবার ভরসা শ্রীমন্তের হইল না। দুই দিন বসাইয়া অতিথি-সংকার করিবার পর সে উহাদের গোয়াল নিকানো ও মাখন টানিবার কাজে লাগাইয়া দিল। কহিল, 'আপনারা অতিথ। পাঁচ গাঁয়ে ফেরি করে' বেড়াবেন, সি কি একটা কতা হলো। আকাল পড়েচে বলে নেহাৎ পেটের দায়েই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েচেন…'

বস্তুতঃ এই 'আকালের' কল্যাণে তাহারা বহু জায়গায় নানা কাজ পাইয়াছে এবং বহু সন্দেহের হাত এড়াইতে পারিয়াছে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, গোপ-গিন্নীর সন্দেহের হাত এড়াইতে পারিল না।

আব্‌লুসের মতো কালো এই স্ত্রীলোকটির মেদস্ফীতি লক্ষ্য করিলে কেবলই মনে হইবে, শ্রীমন্ত ঘোষের ঘোল-টানা মাখনের অধিকাংশই ইহার দেহ-গঠনে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটা অসন্তুষ্ট গোলপানা মুখের উপর হ্রস্ব অথচ বিস্তৃত নাকে একটা বড় সোনার নথ একই সঙ্গে শ্রীমন্ত ঘোষের শ্রী এবং শ্রীমন্ত গিন্নীর চরিত্রের কাঠিন্য ঘোষণা করিতেছে। গাদা-বন্দুকের আওয়াজের মতো একটা কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই হুঙ্কার করিয়া একে

ধমকাইতেছে, ওকে শাপ-শাপান্ত করিতেছে এবং সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মানুষ এবং ব্যবস্থার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছে।

দুই দিন যাইতে না যাইতেই গাদা-বন্দুকটি সে অতিথিদ্বয়ের দিকেও তাগ্‌ করা শুরু করিল: 'আ হা হা, গোয়াল-নিকোনোর ছিরি দেকে মরে যাই! চার কোণায় বিচালি গড়াগড়ি খাচ্চে, কাচালে তিন কাঁড়ি গোবর উটে' আসবে, কালকের জাব্‌নার তলানি এখনও পড়ে আচে, এর নাম গোয়াল নিকোনো! তখুনি আমি পই পই করে বারণ করেছিলাম, দুটো জোয়ান মদ্দ না দুটো এঁড়ে ষাঁড়, খোরাকি জোগাতেই ভাঁড়ার উজোড় হবে। তা কি শুনলে আমার কতা, কেউ কি তা গায়ে মাখলে! এখন একবার দেখুক এসে! এই আকাল-অভাবের বচরে গেরস্তের দু-কাঁড়ি চাল উড়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কতা! আর ঐ শোন, ভাল-মানুষের ছেলে ঘোলের দড়ি টানচেন! আহা আমার উপকাররে! সেরের জায়গায় তিন-পো মাখন টেনে কাজে বুঝ দেয়া না বুকে বসে ছুরি চালানো! অমন কাজে আমার কাজ নেই। ওর চেয়ে ভালো টানা আমার বৌ-মাগীই টানতে পারে। মেয়েমানুষের অধম ব্যাটা-ছেলে গো!'

গণেশ সামন্ত আশঙ্কিত হইয়া সঞ্জীবের দিকে তাকায়। বলে, 'আর তিন চারটে দিন বৈ নয়, দা'ঠাকুর। এরই মদ্যে গোপিপুকুরের আখ্‌ড়ার কাজ সেরে নিতে পারব। পরশুই তো ওদের মচ্ছোব শেষ হচ্চে…'

শঙ্কিত সামন্ত মশায় শ্রীমন্ত ঘোষের কানেও ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া একটা গোপন সংবাদ দেয়। শ্রীমন্তর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া ওঠে। সামন্তের কথা প্রায় অবিশ্বাস্য বোধ হয়। সবিস্ময়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'বলচ কি, সামন্ত মশাই। হাকিম! হাকিম যেচে এসে আমার ঘরে কাজ নিয়েচে! এ যে পেত্যয় করা কঠিন। ওরে সব্বনাশ, শেষে একদিন পেয়াদা এসে ক্যাঁক্‌ করে' ধরুক আর কি। ধনে প্রাণে নিকেশ হই।' এ যে মহা বিপদে পড়লাম! কি কাণ্ড, হাকিম-কর্ত্তা মানুষ, তাঁর এমনও

শখ হয়! গাঁয়ের চাষাভূষোর আচার-বিচার দেখতে চান তো থাকুন, একশো বার এসে থাকুন। অতিথ্ দেবতা, এ কি আমাদের শাস্ত্রে কয়ে যায় নি? যাই, এবার গিয়ে ক্ষমা-ঘেন্না করতে বলি। কি সব্বনাশের কথা!'

সামন্ত কহিল, 'ওটি করো নি, দাদা। তবে না তোমার না আমার রক্ষে থাকবে। এ কথাটি বলা নিষেধ কিনা। তোমাকে নেহাৎ স্বজন মনে করেই বলে দিলুম। কিছুটি করোনা; যেমন চলচে, তেমনি চলুক। কিছু যেন ঘুণাক্ষরেও টেরটি না পায়। বড় ভালো লোক, উপকার করবে তো অপকার করবে না। তবে কিনা দাদা, বৌদিকে জিবটা একটু সামলে নিতে বলো! গালাগালি শুনে শেষে চটে না যান্।'

নিজের পূর্ব্ব-পরিচয় জানানো সম্বন্ধে সঞ্জীবের কড়া নিষেধ ছিল। কিন্তু নেহাৎ মুস্কিলে পড়িলে নিতান্ত চুপে চুপে সঞ্জীবের প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া সামন্ত-মশায় বহুক্ষেত্রে আসান লাভ করিয়াছেন। এইবারও জানাইলেন। সেই দিনই স্বামী-স্ত্রীতে একটা বিরাট এবং কর্ণভেদী কলহ হইল। শ্রীমন্ত স্ত্রীর বাক্যাগ্নি বর্ষণের মুখে দীর্ঘকাল টিকিতে পারিল না সত্য, কিন্তু অন্তত সাময়িকভাবে তার উদ্দেশ্য সফল হইল। ভালোমানুষের পুত্রদ্বয়ের প্রতি শ্রীমন্ত-গৃহিণী তাহার সুমিষ্ট সম্বোধন স্থগিত রাখিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, এনার্জির মৃত্যু নাই। এবার গাদা-বন্দুকের মুখ তাহার অপর লক্ষ্যের প্রতি নিরবিচ্ছিন্ন অগ্ন্যুদ্গার শুরু করিল।

শ্রীমন্ত ঘোষের স্বামী-পরিত্যক্তা নিরীহ পুত্র-বধূটি উদযাস্ত শাশুড়ির হুকুম তামিল করিয়া নিয়মিত ভাবে শ্বশ্রূ-মাতার নথ-নাড়া ও মুখ-ঝাম্টা নীরবেই সহ্য করিয়া আসিতেছিল, এইবার শ্রীমন্ত-গিন্নীর মুখ-নিঃসৃত গোলাগুলি একান্তভাবে তাহার উপর গিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিল। বধূর পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের এমন কেহ বাকি রহিল না যে নিস্তার পাইল। গর্জ্জনের সহিত বিদ্যুৎ-চম্কানির মতো গোপ-গিন্নী নথ উদ্যত করিয়া বধূর

দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন, একবার খ্যাংরা-ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া তরোয়াল ঘুরাইতেছেন, একবার শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া আহত ব্যাঘ্রের মতো নিচে নামিয়া আসিতেছেন। তাহার রাগ আর পড়েই না। বধূ যতই চুপ করিয়া থাকে, গোপ-গিন্নীর পুঞ্জিত রাগ যেন আরও পাক্ খাইয়া ওঠে।

আজ ভোর হইতেই গণেশ সামন্ত তোড়জোড় করিতেছে। আজই গোপিপুকুরের বৈষ্ণব আখড়ার 'মচ্ছোবে'র শেষ দিন। এখান হইতে সামন্তমশায় অমূল্য মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন, এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্যই শ্রীমন্তের বাড়ি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন।

এতক্ষণে গোয়াল-নিকানো শেষ করিয়া বৌল-ভরা আমগাছটার ছায়ায় বসিয়া সে তৃপ্তিভরে তামাক টানিতেছিল। শ্রীমন্ত আখড়ায় দই ও ঘি জোগান দিতে গিয়াছে। ঘরের ভিতরে ঘোলের হাঁড়ির উপর ঝুঁকিয়া সঞ্জীব মাখন টানিতেছে। বড় হাসি পাইতেছে সঞ্জীবের। দ্বাপর-যুগের এই ভূমিকা লইয়া কি তার পক্ষে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব? এই কাজে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করা হয়তো অসম্ভব নয়; ইহার আয়ে শান্ত গাঁয়ে কুঁড়েঘর তৈয়ারি করিয়া নিরুপদ্রব জীবন কাটানো সম্ভব। কিন্তু সভ্যতা যখন এত বিচিত্র সুযোগ ও সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, তখন কি প্রগতিশীল মানুষের মনকে এই অকিঞ্চিৎকর কাজে বাঁধিয়া রাখা চলিবে? যন্ত্র যে সমারোহ ও আড়ম্বর, যে উৎপাদন ও আয়-বৃদ্ধির সুযোগ আনিয়াছে, মানুষের পক্ষে কি তা অস্বীকার করা সম্ভব? মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়া কি···

সহসা একটা কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে সঞ্জীবের চিন্তা-সূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কারখানার সিটির মতো তীব্র শ্রীমন্ত-গিন্নীর হুঙ্কার কানে প্রবেশ করিল: 'বজ্জাত মাগী, দেক্‌চিস্ কি, উঁকি মেরে দেক্‌চিস্ কি শুনি?

সেই সক্কাল থেকে বসে এই কটি মাত্তর ঘুঁটে দিইচিস্! মাগো, কোথায় যাব! এর মদ্ধ্যে যে তিনটে মাঠ ভর্‌তি করে' ফেলা যায়। হাতের কাজ চুলোয় ঠেলে জান্‌লা চেয়ে কি গিলচিস্ শুনি? বাজা মেয়েমানুষ, হায়া নেই! পরপুরুষের দিকে নোলা বের করে' চেয়ে আচিস্! আবাগীর বেটি আবাগী, এমন চরিত্তির না হলে আমার অমন ছেলে ঘর ছেড়ে দেশান্তরী হয়! ধনে-প্রাণে মারলে কুবংশের মেয়ে, ঘরে অলক্ষ্মীর হাওয়া ঢুকিয়ে দিলে! "কাজ করচি মা, কাজে তো কামাই দিই নি!" আহা, মরে যাই, কামাই না দেবার ধরণই বটে! হাঁ করে জান্‌লার দিকে চেয়ে আচিস্, আমি নিজ চোকে দেকিনি? নোড়া দিয়ে তোর দাঁত ভেঙে না দিই তো আমি…'

নোড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ দাঁত ভাঙিয়া দেওয়া অবশ্য সম্ভব হইল না, কিন্তু নোড়ার বিকল্প হিসাবে 'দুম্' 'দুম্' শব্দে কি দ্রব্য বিতরণ করা হইল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

গণেশ সামন্ত 'হাঁ হাঁ' করিয়া দৌড়াইয়া আসিল। আরও কটূক্তি এবং আরও গর্জ্জন উঠিল। মনে হইল, শ্রীমন্ত-গৃহিণী তোপ ছাড়িয়া পৃথিবীটা উড়াইয়া দিবেন।

সঞ্জীব একবার জানালার ধারে গিয়াছিল, আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। শাশুড়ির প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলার কত নিরীহ বধূ যে নির্য্যাতিত হইয়াছে, আমাদের সামাজিক ইতিহাস তার দৃষ্টান্তে ভরপুর। মানুষকে নিজস্ব সম্পত্তি বিবেচনা করিবার রেওয়াজ যে এখনও যায় নাই, এইখানে তাহার আর একটা উদাহরণ পাওয়া গেল। অথচ সঞ্জীব এই নিরপরাধ মেয়েটার কোনই উপকার করিতে পারে না; দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শাশুড়ির কাছে এই লাঞ্ছনা উহাকে দিনের পর দিন এমনই নীরবেই সহ্য করিতে হইবে।

'চাঁদপানা মুখ নিয়ে এসেছে তোমার ঐ ভদ্দরনোকের ছেলে! তাই

দেকে আমার ঘরের বউ মোহিত হয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকবে, আর আমি কিচ্ছুটি বলতে পারব নি? আবার চোক-রাঙানো হচ্ছে, মারচি কেন! তুমি বাধা দেবার কে শুনি? এর পর তো বলবে, তোমার সাঙ্গাত চোখ ঠেরে এর জবাব দিলেও কিচ্ছুটি বলতে পারব নি! কথা শুনে মরে যাই।…' গোপ-গিন্নীর কণ্ঠের চুল্লী হইতে অনর্গল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন গণেশ সামন্তের পক্ষেও ব্যবহারটা অসহ্য বোধ হইল। সঞ্জীবের কাছে আসিয়া এক সময় সে চুপে চুপে কহিল, 'চলুন, দা'ঠাকুর, এখেনে আর নয়। একেবারে জাত-সাপের গর্ত্তে এসে ডেরা বেধেছিলাম, আর নয়। আর আজই যখন আমাদের কাজ শেষ হচ্চে, তখন আর মিছে কেন পড়ে থাকি। পোঁটলা-পুঁটলি মুদির দোকানে জিম্মা করে' একেবারে গোপিপুকুরের আখড়ায় বসি গে, চলুন। ওখেনেই পেসাদ পাব এখন। কাল ভোরেই আমরা এ গাঁ ছাড়ছি। সাতদীঘি গাঁয়ে গাজনের সময় বড় জাঁকজমক। চোত-সংক্রান্তির আগেই সেখানে পৌছান চাই। সেদিন হোথায় কবি-অলাদের মস্ত জল্সা বসে।…তা সে এখনও দু হপ্তা, কোনও তাড়া নেই। আরও দু পাচটা গাঁ দেকে যাওয়া চলবে। কিন্তু জাত-সাপের এ-গর্ত্তে আর নয়, দা'ঠাকুর। মেরে ফেলবে এই একরত্তি মেয়েটাকে, মেরে ফেলবে এই রাক্কুসী…'

তেরো

গোপিপুকুরের কবি-সম্মেলন শেষ হইতে রাত এগারোটারও বেশি হইল। সামন্তমশায় পূর্ব্বেই গ্রামের মুদি মধুসূদনের কাছে পোঁটলা-পুঁটলি জমা দিয়া শুইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। আখড়ায় উৎসব উপলক্ষ্যে যে রকম লোকের ভিড় তাহাতে সেখানে শুইবার জায়গা সংগ্রহ সোজা ব্যাপার হইত না।

কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে প্রায় ক্রোশব্যাপী পতিত ডাঙাটা আড়াআড়ি ভাবে পার হইবার জন্য দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। গণেশ সামন্ত উচ্ছ্বসিত ভাবে সেদিনকার সম্মেলনে পঠিত বিবিধ পদের আলোচনা করিতে লাগিল, এবং ইতিমধ্যেই সে কোন্ কোন্ পদ লিখিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার অফুরন্ত বিবৃতি দাখিল করিয়া নির্জ্জন প্রান্তরের নৈঃশব্দ্য যথাসম্ভব দূরে রাখিল। পায়ে-হাঁটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথ; দুদিকে বুনো লতাগুল্ম। মাঠের এই কাঁটাগাছ ও এরণ্ড সমাবেশের মধ্যে হয়তো একটা বিরাট বটগাছ বা অশথ বা পলাশ নিজেদের বিরাটত্ব ঘোষণা করিয়া অকিঞ্চিৎকর ঝোপঝাড়কে চোখ রাঙাইতেছে। দু'চারটে আধ-মজা পুকুর এবং অধুনা শুষ্ক জলাশয়, এক-আধটা ভাঙা মন্দির নিস্ফলা প্রান্তরের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে! মাঠটা সম্বন্ধে গ্রামের নানান লোক নানান কথা বলে। গণেশ সামন্তও তার কিছু কিছু শুনিয়াছে, কিন্তু অনায়াসেই তাহা সে উপেক্ষা করিয়াছে। গ্রাম হইতে আখড়ায় আসিবার ইহাই সব চেয়ে কাছের পথ। সুতরাং ঝোপ-জঙ্গল কাঁটাবন যাহাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

গণেশ সামন্ত তার মোটা লাঠিটা বগলে চাপিয়া তন্ময় হইয়া

কাব্যালোচনা চালাইতে লাগিল। চলিতে চলিতে যতই সে বিশেষ বিশেষ পদের উৎকর্ষের কথা বলিতেছে, ততই সে মাতিয়া উঠিয়া পদকর্ত্তার বংশ-পরিচয় এবং ইতিহাস টানিয়া বাহির করিতেছে। বলিতেছে, 'হবে না, দা'ঠাকুর, হবে না। এ যে খোদ হীরু ঠাকুরের দৌহিত্র-বংশ! হীরু ঠাকুরের পদ শুনে বনের পশু হিংসে ভুলে যেত, গাছের পাখি গান বন্ধ করে' কান পেতে শুনত! লিকেচিল বটে "নৌকাবিলাস"। এমনটি আর দুই কানে শুনলুম না। ন'পুরের আখড়ার মোহান্ত গোপীদাস বাবাজীর পদকর্ত্তা বলে নাম ছিল। একবার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তিনি এলেন হীরু ঠাকুরের সঙ্গে টেক্কা দিতে। আমরা তখন ছেলেমানুষ। দল বেধে চললাম নিশম্ভুপুরের বারোয়ারি-তলার দিকে। পথে গোবিন্দপুকুরে বাবুদের মস্ত ফলের বাগান। আমাদের দলের নটবর পাল বল্লে, এসো দাদা, বাগানটা একবার ঘুরে আসি। কম পথ তো হাঁটিনি, খিদেটা বেশ চাগাড় দিয়ে উঠেচে।...নটবর ছেলো ওস্তাদ মৃদঙ্গী। ওর বাপ হলধর পাল...' প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া সামন্ত কখন থামিত তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না, সহসা সে বার কয়েক ঢোক গিলিয়া, একটা সম্পূর্ণ সেকেণ্ড নির্ব্বাক থাকিয়া উদ্বেগের কণ্ঠে কহিল, 'ওটা কি, দা'ঠাকুর? সামনে একবার চেয়ে দেকুন দিকি। দপ্ করে' জ্বলে উঠচে, আবার ফস্ করে' নিবে যাচ্চে! কতক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করচি, ভেবেচি চোকের বিভ্রম। কিন্তু এ যে দেখতে দেখতে এগিয়ে এলো, দা'ঠাকুর! বলি, উপদেবতা-টেবতা নয় তো!...'

সঞ্জীব আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কুয়াসায় দূরত্ব-নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু কতক্ষণ ধরিয়াই একটা আগুনের শিখা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নিবিয়া যাইতেছে, এবং ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। এই গতিটাই রহস্যজনক। ইহা যে লণ্ঠনের আলো নয়, তাহা অতিশয় সুস্পষ্ট। অথচ ইহা চলন্ত আলো।

সঞ্জীব ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু যেহেতু তাহার শিক্ষা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেই হেতু সে ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণ উদ্ভাবন করিয়া কহিল, 'চারদিকে ডোবা পুকুর জলো-জায়গা আছে, সম্ভবত আলেয়া...'

'আলেয়া কি গো, দা'ঠাকুর!' গণেশ সামন্ত প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসচে, দেখচেন না? আলেয়া বরাবর রাস্তা ধরে' আসবে কেন? আর একে মানুষই বা বলি কোন্ ভরসায়? আলোটা একবার দপ্ করে' জ্বলে উঠচে, আবার পরক্ষণেই ধ্বস্ করে' নিবে যাচ্চে! এ উপদেব্‌তা, নিঘ্‌ঘাত উপদেব্‌তা!' এবং সঞ্জীবের দিকে চাহিয়া লইয়া ভরসা-দানের স্বরে কহিল, 'আজ্ঞে, ওদের কাচে কিচ্ছু ভয় নেই। অতীতে বহুবার আমি উপদেব্‌তার দ্যাখা পেইচি। ওদের ক্ষতি না করলে ওরাও কারুর ক্ষতি করে না। মিচেই লোকে ওদের ভয়ে সারা হয়। তবে হ্যাঁ, সম্মান দ্যাকানো চাই। অচ্ছেদ্দা করলে ওরা চটে ওঠেন। আসুন, দা'ঠাকুর, রাস্তাটা থেকে নেমে ঐ অশথ্‌গাছটার গুঁড়ির আড়ালে একটু দাঁড়িয়ে যাই। আগে ওকেই পথ দিই, চলে যাক্। মিছিমিছি ঘাঁটিয়ে লাভ কি বলুন...'

গণেশ সামন্তের উপদেশকে সম্মান করিয়া সঞ্জীব সকৌতূহলেই তাহার অনুগামী হইল, এবং গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়িটার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই অতি-প্রাকৃত ঘটনার রহস্যভেদের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গণেশ সামন্তের বগলের লাঠি এখন হাতে আসিয়াছে। উপদেবতার প্রকৃতি সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিলেও সে কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই; যে কোনও পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছে।

রহস্যময় অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত ও নির্ব্বাপিত হইতে হইতে ক্রমেই কাছে আগাইয়া আসিল। কোনও প্রাকৃত ঘটনা বলিয়াই ইহাকে সনাক্ত করা

গেল না। সঞ্জীবের বুকটা পর্য্যন্ত উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তবে কি শেষ পর্য্যন্ত ভূতই বিশ্বাস করিতে হইবে! অসম্ভব কি। আমাদের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ! কত বিচিত্র ব্যাপার আমাদের অজ্ঞাতে ঘটিয়া যাইতেছে, আমরা তাহার কোনই খোঁজ রাখি না। নির্জ্জন গ্রামের অন্ধকারের বিভীষিকার মধ্য হইতে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি বলিয়া সভ্য লোকেরা মনে করে, তাহা যে স্বকপোলকল্পিত নয়, শীঘ্রই হয় তো তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইবে।

সহসা অগ্নিদীপ্তির মধ্যে অতিশুভ্রবসনা এক নারীমূর্ত্তির আভাস আত্ম-প্রকাশ করিল। ক্রমে ইহার দেহরেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বিস্মিত সামন্ত মশায় বিমূঢ়ভাবে সঞ্জীবের সহিত একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া লইলেন।

মেয়েটির বাম হাতে একটা ছোট জ্বলন্ত মশাল। শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়ানো। দোলের সময় আবীর রাখিবার জন্য মেয়েরা যেমন কোঁচড় তৈয়ারি করে সেই রকম একটা স্ফীত কোঁচড় হইতে মুঠা মুঠা কি উঠাইয়া সে মশালের উপর ছিটাইয়া দিতেছে। এই ইন্ধন উপহার পাওয়া মাত্র দুর্ব্বল মশালটির ক্ষীণ শিখা অনেকগুলি জিহ্বা মেলিয়া একটা চওড়া বৃত্ত হইতে সকল অন্ধকার চাটিয়া লইতেছে।

সঞ্জীব ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বেই গণেশ সামন্ত উপদেবতাকে না চটাইবার সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া গাছের আড়াল হইতে সহসা তীরের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচাইয়া কহিল, 'এ কি কাণ্ড, বৌমা! তুমি এখেনে কেন! চোখ দুটোকে যে বিশ্বেস করতে পারচি নে! এ বেশে এই ছাড়া ভিটেয় তুমি কেন? যাচ্চ কোতা? ও দা'ঠাকুর, এগিয়ে আসুন, দা'ঠাকুর। এ উপদেব্‌তা নয়। এ যে আমাদের শ্রীমন্ত ঘোষের ব্যাটার বৌ! কি কাণ্ড দেখে যান্...'

শ্রীমন্ত ঘোষের পুত্রবধূই বটে। কিন্তু যাহার ভয়ে কিছুক্ষণ আগে

দুই দুইজন পুরুষ তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, সে নিজেই এবার বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তার পা কাঁপিতেছে, ঠোঁট কাঁপিতেছে। হাত হইতে মশাল এবং কোঁচড় হইতে ধূপের গুঁড়ো সমস্তই নিচে গড়াইয়া পড়িয়াছে।

ধরা-পড়া চোরের মতো স্খলিত-কণ্ঠে সে প্রায় আকুতির সঙ্গে কহিল, 'দোহাই তোমাদের, দোহাই তোমাদের, আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো না। তবে আর আমি বাঁচব না। আমাকে মেরে ফেলবে। জ্যান্তে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে। তোমাদের পায়ে পড়ি গো। মানুষের শরীলে আর যে সইতে পারি নে। দোহাই তোমাদের, আমার কোনও মন্দ ইচ্ছে নেই, আমি ভায়ের বাড়ি পালিয়ে যাচ্চি। মা-বাপ মরা ছোট বোনকে সে ঠেলতে পারবে না, দুটো ভাত না দিয়ে পারবে না। দোহাই তোমাদের, আমাকে তোমরা ফিরিয়ে নিয়ো না…'

'কোন্ গাঁয়ে তোমার বাড়ি, বাছা?' গণেশ সামন্ত সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া কহিল।

'গাঁয়ের নাম উজানি', ভীত হরিণীর মতো গণেশ সামন্তের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল। 'এখেন থেকে তিন ক্রোশের পথ। ভেবো নি আপনারা, আমি ঠিক চলে যাব, বরাবর চলে যাব…'

'তা বাছা, এমন করে' মশালে ধূনো ছিটিয়ে চলছিলে কেন?' সামন্ত প্রশ্ন করিল। 'আমরা তো ভেবে মরি, কোনও উপদেব্‌তা-টেব্‌তাই চলেচে বুঝি। এমনও ভয় দেখাতে হয়!'

শ্রীমন্ত ঘোষের পুত্রবধূ ক্ষণকাল নতমুখে চুপ থাকিয়া অবশেষে এই অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ প্রদান করিল। একলা মেয়েমানুষ এতরাত্রে পথে চলিতেছে। ভূত মনে করিয়া ভয় পাইয়া চোর-বদ্‌মাস যাহাতে কাছে না আসিতে পারে, তাই এই অভিনব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তার কোন্ সইয়ের মা একবার এমনি করিয়া শ্বশুড়বাড়ি

হইতে পালাইয়া নিরাপদে পিতৃগৃহে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ কৌশলটা তাহার কাছ হইতে গল্প শুনিয়া শেখা।

কাহিনী শুনিয়া সঞ্জীব পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গেল। গণেশ সামন্ত বিপন্ন কণ্ঠে কহিল, 'এখন কি করা যায়, দা'ঠাকুব। এ যে বড হাঙ্গামায় পড়া গেল !.. '

'হাঙ্গামা আর কি,' সঞ্জীব সহজ ভাবেই কহিল। 'একে তো আব একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। চলুন, এর দাদার কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসা যাক। তিন ক্রোশ এমন কিছু দূবেব পথ নয়। রাতারাতিই ফিরে আসা যাবে ..'

চৌদ্দ

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। ঢাকের শব্দে সারা সাতদীঘি গ্রামখানি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বৈকালের দিকে এই বাজনার তীব্রতা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। বুড়া শিবতলার প্রকাণ্ড আঙ্গিনায় একশো আটটি ভাঙা শিবমন্দিরের একশো আটটি বিগ্রহের চোখের সামনে প্রচুর গাঁজা ও সিদ্ধি পান করিয়া গাজন-উৎসাহীরা দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কসরৎ প্রদর্শন ও নানা রকম মাতামাতি করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিল। পূর্ব্বে আরও নানা রকম দুঃসাহসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎসবটির সম্মান করা হইত; ভক্তি এবং ভাঙের মাদকতায় লোকে তরোয়ালের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে, পিঠে বড়শি ফুঁড়িয়া শূন্যে ঝুলিয়াছে, এবং আরও অনেক চমক্‌প্রদ কাণ্ড করিয়াছে। এখন আর অতটা হয় না, তবে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপির কিছু কম্‌তি নাই। নাচিয়া লাফাইয়া, ঘুরপাক খাইয়া, বমি করিয়া, 'দশায়' পড়িয়া এখনও গাজনের মান রক্ষা করা হয়।

গাজন উপলক্ষ্যে প্রতিবারই মেলা বসে, এবারও বসিয়াছে। দোকানে, বাঁশিতে, খেল্‌নায়, নাগর-দোলায় বুড়া শিবতলার চারদিক গম্‌ গম্‌ করিতেছে। পাঁচখানা গ্রামের লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে সাতদীঘির চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসবে। এটা এ অঞ্চলের একটা বিশেষ ঘটনা। বহুদিন ধরিয়া অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন চলে; কমিটি গঠিত হয়, জমিদারবাবুকে প্রতিবৎসরই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত করা হয়।

সাতদীঘি বড়ো গ্রাম। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামখানি চারদিকে বিস্তৃত। স্কুল, হাসপাতাল, হাট-বাজার, কিছু পাকা

বাড়ি এবং শিবতলার একশো আটটি শিবমন্দির ইহার সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। জমিদার রাজশঙ্কর রায় গ্রামেই বাস করেন। তাহার জীবনের সত্তর বছরের অধিকাংশটাই তিনি গ্রামে বাস করিয়াছেন।

আমুদে মানুষ রাজশঙ্কর রায়। বছর দুয়েক আগে স্ত্রী-বিয়োগের পর একটু দমিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া পড়েন নাই। দুটি সন্তানের মধ্যে পুত্র সন্তানটি শৈশবেই মারা যায়। কন্যা বিভাময়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন নিশানপুরের বিখ্যাত চৌধুরি পরিবারে। বহু টাকা ব্যয় করিয়া ব্যারিস্টর জামাই আনিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তি পান নাই—না নিজে না কন্যা। মদ্যপ জামাইয়ের আয়ের অসচ্ছলতা ও ব্যয়ের প্রাচুর্যে পিতা এবং পুত্রী উভয়েই তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু অর্থ দিয়া রাজশঙ্কর কন্যাকে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু মরুভূমিতে জল-সিঞ্চনের মতো তাহা নিরঞ্জন চৌধুরির প্রবল তৃষ্ণার মুখে উড়িয়া গিয়াছে। মদের সঙ্গে নানা উপসর্গ আসিয়া জোটে, নানা সমস্যা দেখা দেয়। বিভাময়ীর জীবন কণ্টক-শয্যা হইয়া ওঠে। রাজশঙ্কর আলবোলা টানিতে টানিতে এখনও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবেন, বিভাময়ীর মৃত্যু তাহার মানসিক ব্যাধিরই ফল, শারীরিক ব্যাধিটা উপলক্ষ্য ছিল মাত্র।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। বুড়া শিবতলার ঢাকের বাদ্যিতে হয়তো একটু ঢিলা লাগিয়াছে। সন্ধ্যার পর কবি-গানের আসর বসিবে। ইহাতে রাজশঙ্করের উপস্থিত না থাকিলে চলিবে না। বস্তুত ইহাতে উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিয়াই তিনি গাজনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

চাকরের হাত হইতে কোঁচানো ফরাসডাঙা ধুতি লইয়া রাজশঙ্কর রায় কাপড় বদ্‌লাইলেন। গিলে-করা পাঞ্জাবি গায়ে পরিলেন। পায়ে উঠিল বার্ণিশ-করা কালো লপেটা। ডান হাতের বগলের তলা দিয়া পাকানো

ঢাকাই উড়্নি বাঁ কাঁধের উপর আনিয়া তুলিলেন। আকর্ণবিস্তৃত শাদা গোঁফে আতরের স্পর্শ পড়িল। তারপর চাকরটাকে কহিলেন, 'যা, দিদিমণির সাজ হলো কিনা, খোঁজ নে।'

নাতিনী ইলা দিন পাঁচ-সাত হয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ইলা রাজশঙ্করের প্রিয় দৌহিত্রী। বছরে অন্তত দুএকবার সে না আসিলে রাজশঙ্করের সময় আর কাটে না। এই নিঃসঙ্গ জীবনে তিনি যেন এই হাস্য-ময়ী, নৃত্য ও রঙ্গকুশলা নাতিনীর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। ইনিই বায়না ধরিয়াছেন, বিলাত যাইবেন! গত বৎসরই জেদ করিয়াছিল; অতি কষ্টে আগামী বছরের ভরসা দিয়া আটকানো গিয়াছে। কিন্তু এবার কি আর আটকানো যাইবে? কি কাণ্ড দেখ দিকি! মেয়েমানুষের বিলেত যাইয়া কি লাভটা হইবে! সে কি তার বাবার মতো ব্যারিস্টর হইবে নাকি? না প্রাচ্য-নৃত্যের জায়গায় জুড়ি-মেলানো নাচ, লাথি-দেখানো নাচ না শিখিলে চলিবেনা?—রাজশঙ্কর সাতঙ্কে ভাবেন। ইলা এবার এখনও প্রসঙ্গটা তোলে নাই, কিন্তু ইহা যে আসিতেছে, ঝড়ের পূর্ব্বাভাসের মতো তাহার সমস্ত লক্ষণ রাজশঙ্কর লক্ষ্য করিয়াছেন।

ইলার শখের জন্য দশ-পনেরো হাজার টাকা ব্যয় করা রাজশঙ্করের কাছে এমন কিছু নয়, কিন্তু সে যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়া সাতদীঘি হইতে বহু সহস্র মাইল দূরে চলিয়া যাইবে, হুট্ করিয়া ইচ্ছেমত এখানে আসিয়া হাজির হইতে পারিবে না, হাসি-কৌতুকে বাড়িটা মশগুল হইবে না, বৃদ্ধ রাজশঙ্কর এ-কল্পনা সহ্য করিতে পারিতেছেন না।

'দাদু।'

'আরে, হয়ে গেচে তোর! এরই মধ্যে হয়ে গেল—মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে!' রাজশঙ্কর আরাম-কেদারা হইতে সহাস্যমুখে উঠিয়া পড়িলেন। 'আরে দিদিমণি, এ করেচিস কি! এ যে চোখ ফেরানো যায় না! বুড়ো বয়সে আমারই যে ভির্মি খাবার উপক্রম হলো…'

নাতিনী ইলা সাজগোজ করিয়া দাদুর খাস্-কাম্রায় প্রবেশ করিয়াছে। ইলা সুন্দরী, বরঞ্চ প্রচণ্ড সুন্দরী মেয়ে। চোখের দৃষ্টি চটুল, দেহের ভঙ্গি মনোরম, ওষ্ঠের রেখা লোভনীয়। গৌরবর্ণ মুখে প্রসাধনের প্রলেপ সুস্পষ্ট, গণ্ডের লালিমা সযত্নকৃত, ভ্রূ ও পক্ষ্ম কাজল-রেখাঙ্কিত, নখরাবলী নিখুঁতরূপে সুরঞ্জিত। পৃথিবীর প্রসাধন-বিশেষজ্ঞেরা নারী-সুষমা বিকৃত করিবার যত কিছু উপকরণ উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং নগরীর রূপ-সংস্কার বিপণির শ্বেতাঙ্গিণী মালিকেরা যে-জ্ঞান ও উপকরণ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে, ইলা তাহার সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে।

কলিকাতার সমাজে সে বিখ্যাত মেয়ে। জনসাধারণের মধ্যে তাহার নাচের এবং স্তাবকমণ্ডলীর মধ্যে তাহার রূপের বিপুল খ্যাতি। তবে প্রকৃত বুদ্ধিমতীর মতো রূপের দামই যে বেশি তাহা উপলব্ধি করিয়া সে এটির দিকেই বেশি নজর দিয়া থাকে। এই রূপের আগুনে শত শত পতঙ্গ আসিয়া পুড়িয়া মরে। কেউ বলে, 'ফ্লার্ট', কেউ বলে 'বোয়া-কন্‌স্ট্রিক্‌টার', কেউ বলে 'রহস্যময়ী', কেউ বলে 'খারাপ মেয়ে', কেউ বলে, 'ওর মন কোথাও বাঁধা আছে।' কিন্তু ইলা সম্বন্ধে সমাজের দশ-জনের কৌতূহলের অন্ত নাই।

পাঞ্জাবির গিলে-করা জায়গাটায় দাদুর হাতের ডানা চাপিয়া ধরিয়া ইলা ভুবনজয়ী হাস্য করিয়া কহিল, 'ভির্মি খেয়ে কিচ্ছু লাভ হবে না। আয়নায় নিজের শাদা মাথাটা কি দেখতে পাও না?...'

'আরে, এক ঐ পাকা চুলেই যদি তোর আপত্তি, তবে তার বিহিত আছে রে, দিদিমণি', রাজশঙ্কর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলিয়া কহিলেন। 'টাকা খরচা করতে পারলে ভালো কলপের অভাব কি? শহরের যে কুচুণ্ডে ছোক্‌রাগুলো তোর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়, আমার চেয়ে তারা কোন্ দিকে...'

'তুমি বড়ো অসভ্য হয়ে উঠেছ, দাদু।' ইলা ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি

দিয়া মুখে কৃত্রিম বিরাগ ফুটাইয়া কহিল। 'আমার পেছন পেছন কেউ-ই ঘুরে বেড়ায় না।…নাও, আর দেরি করো না। কবি-গানের শুরুটা কক্ষনো দেখিনি, চিরকাল তুমি দেরি ক'রে পৌচেছ। এবার শুরু হবার আগেই হাজির হওয়া চাই।'

'তবে চল। আমি তো খিদমতে হাজিরই আছি।' রাজশঙ্কর কহিলেন।

সামিয়ানার প্রবেশ-মুখে ডে-লাইটের তলায় কবি-গানের উদ্যোক্তাদের অনেকেই উদ্বিগ্নভাবে জমিদারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাহিরের ফটকের মুখেও লোক মোতায়েন আছে; জমিদারের জুড়িগাড়ির আওয়াজ শুনিতে পাইলেই ইহারা খবর পাঠাইবে।

সামিয়ানার তলায় আসরের চারিদিকে শ্রোতারা ইতিমধ্যেই ভিড় করিয়া বসিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পক্ষেরা কাব্য-যুদ্ধের পায়তারা কষিতেছেন; ঢোলের শব্দ হইতেছে তাগ্‌ ধিনা ধিন্‌ ধিন্‌, তাগ্‌ধিনা-ধিন্‌ধিন্‌। এমন সময় খবর আসিল, দূরে জমিদারের জুড়িগাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। অমনি উদ্যোক্তারা ছুটিলেন, ছেলেপিলেরা ছুটিল, লোকে লোকে ফটক হইতে সামিয়ানায় পৌছানোর পথটা পূর্ণ হইল। যেন জন-সমুদ্রে একটা তিমিমাছের লেজের ঝাপ্‌টা লাগিয়াছে।

শিবতলার বটগাছ-গজানো পুরানা সিংহদ্বার দিয়া অভ্যর্থনাকারী ও রবাহুত-পরিবেষ্টিত জমিদার রাজশঙ্কর রায় সামিয়ানার দিকে আগাইয়া চলিলেন। সকলে একই সময়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য এত বেশি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো পথ পাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভিড়ের মধ্যে ইলা দাতুর কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

নারীর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাশীল পাশ্চাত্ত্য দেশের উৎসব-অভ্যর্থনার

চলচ্চিত্রেও ইলা এটি লক্ষ্য করিয়াছে। সম্রাট ও সম্রাট-পত্নী একই সময় ক্রহাম-গাড়ি হইতে অবতরণ করিলে হোম্‌রা-চোম্‌রা অভ্যর্থনাকারীরা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নারীভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া সম্রাটপত্নীর চেয়ে সম্রাটের দিকেই বেশি নজর দিয়া থাকে। ইলা নতুন করিয়া হতাশ হইল না। দাদুর সঙ্গ রাখিবার চেষ্টা না করিয়া অভিজাত-সুলভ ঔদাসীন্য সহকারে সে পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলিল। যাহারা তাহার চারদিকে চলিল, তাহারাও এমন মেমের মতো মেয়ের কাছে আগাইয়া খাতির দেখাইবার ভরসা পাইল না; যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া সসম্ভ্রমে নীরবে সঙ্গে চলিল। লোকের ভিড়ে, ঢোলের চাঁটিতে, কৌতূহলী শিশুদের ছুটোছুটি চেঁচামেচিতে, অ্যাসিটেলিন আলোর তীব্র দীপ্তিতে সব কিছুই একটা অবাস্তব বিভ্রম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

'সঞ্জীববাবু!'

সহসা ইলা এই চলন্ত শোভাযাত্রার মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িল। জমিদারকে পথ দিবার জন্য সঞ্জীব পথের একপাশে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ইলার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল।

সঞ্জীব অবাক হইয়া চোখ তুলিয়া চাহিল।

'আপনি এখানে কি করে!' ইলা কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল। 'কোথায় উঠেচেন? কবে এসেচেন?...'

'এখানকার গাজন দেখতে এসেচি। আজকেই এসেচি।' প্রতিমার নাচুনে বন্ধু ইলাকে কয়েক সেকেণ্ডের বিস্ময়ের পরই সঞ্জীব চিনিতে সমর্থ হইল। 'আপনিই বা এখানে কোথা থেকে এলেন?'

'বাঃ রে, আমার দাদু যে সাতদীঘির জমিদার, তা জানেন না?' ইলা এ-খবর না-জানার অপরাধের জন্য প্রায় তিরস্কার করিয়া কহিল। 'প্রতিমার কাছে শোনেন নি কখনও?...কত আশ্চর্য্য ব্যাপারই জগতে

ঘটে, নইলে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে, কে ভেবেছিল! প্রতিমা যদি আগে একটা খবর দিত!···কিন্তু কোথায় উঠেচেন বল্লেন না তো?···'

'উপস্থিত মুদির দোকানে আছি।' সঞ্জীব যথাসাধ্য সম্ভ্রান্তভাবেই জানাইল।

'মুদির দোকান!' ইলা স্তম্ভিত হইয়া কহিল। 'এ কি কাণ্ড! যান্, আপনি ঠাট্টা করচেন। আপনার গ্রাম-উন্নতি সঙ্ঘ কেমন চলচে?'

'সেটা ভেঙে গেচে।'

'ভেঙে গেচে! না না। তাও কখনও হয়। চারদিকে তার কত নাম হয়েচে, শুনলাম। আপনি আবার ঠাট্টা করচেন। গত বার দাদুর মুখে পর্য্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা শুনে গেচি। এ কখনও হ'তে পারে না। কেন ভেঙে গেল?···'

'মিলের প্রতিযোগিতায় টিকলো না।···আপনি ভেতরে যান। চার-দিকে ভিড় জমে গেছে···'

ইলা এইবার নিজের চারদিকে চাহিয়া অসংখ্য কৌতূহলী চোখ আবিষ্কার করিল। কহিল, 'তবে আপনিও আসুন। এমন ভাবে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারবনা।···কথা শোন একবার, মুদির দোকানে আছি! কি কাণ্ড বলুন তো! আপনি আমাদের অতিথি। কোনও আপত্তিই শুনবনা। আসুন···'

ভিড়ের দিকে একবার তাকাইয়া সঞ্জীব আর কথা বাড়াইল না। ইলার সঙ্গে সে সামিয়ানার দিকে আগাইয়া গেল। আসরের সর্ব্ব প্রথম সারিতেই গণেশ সামন্ত জগতের সকল আগ্রহ নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া পালা আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সঞ্জীব তাহার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। সঞ্জীবকে অত কাছে বসিতে রাজি করিতে না পারিয়া সে

হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। মণি-মাণিক্যের প্রতি এমন ঔদাসীন্যে সে ব্যথা পায়। কিন্তু সে বুঝিয়া লইয়াছে, কাব্য খোঁজার চেয়ে দা'ঠাকুরের মানুষের সঙ্গে মিশিবার আগ্রহ বেশি।

সামিয়ানার তলায় নিজের আসনে আসীন হইবার পর মাত্র রাজশঙ্করের খেয়াল হইল নাতিনী ইলা পাশে নাই। এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া তিনি হাঁকডাক করিয়া উঠিলেন। পলকে অর্দ্ধডজন লোক ছুটিল জমিদার-দৌহিত্রীর সন্ধানে। উদ্বেগে রাজশঙ্কর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবখানা এই যে, সন্ধানকারীরা অন্তর্হিতার খোঁজ না পাইলে, তিনি নিজেই সৈন্য-সামন্ত লইয়া বাহির হইয়া পড়িবেন।

এমন সময় নাতিনী ইলারাণী সঙ্গে এক রাজপুত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার চোখে-মুখে খুসির সকল চিহ্ন পরিস্ফুট।

'একে আবার কোথা থেকে জোটালি!' রাজশঙ্কর দুষ্টুমির কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন। 'নাঃ, আমার আর কোনই আশা নেই দেখচি। এমন সব কার্ত্তিকঠাকুর প্রতিযোগিতা করলে...'

'চুপ, দাদু। তুমি ভয়ানক অসভ্য!' ইলা দ্রুত কাছে আসিয়া কহিল। 'ইনি সঞ্জীববাবু। সঞ্জীবকুমার ঘোষ। ইনিই দশার্ণপুরের গ্রাম-উন্নতি সঙ্ঘের বিখ্যাত সঞ্জীববাবু। তুমিও তো এঁর কথা বলতে, মনে নেই?...'

'বলিস্ কি রে, দিদিমণি! বোকা বানাচ্চিস্ না তো?' বলিয়া রাজশঙ্কর অবাক হইয়া সঞ্জীবের দিকে চাহিলেন। 'এসো বাবা। বসো। এ যে আমাদের মহা সৌভাগ্য। দশার্ণপুরের সঞ্জীববাবু যে মহা মানী লোক। আমার বাড়িতে না-উঠে কোথায় উঠেচ? উঁহু, ওটি চল্‌বেনা। এ-গাঁয়ে এলে আমার কাছে উঠতেই হবে...'

'তা আমি ওঁকে আগেই বলে দিয়েচি, দাদু।' ইলা আহ্লাদী মেয়ের মতো ঘাড় নাড়িয়া, কানের দুল দোলাইয়া কহিল।

'ঐ তো মুস্কিল করলি!' রাজশঙ্কর আবার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন। 'আমার দেখচি আর কোনই আশা রইল না! এ কি অত্যাচার! বসো, বাবা, বসো। গেঁয়ো মানুষ, নাতনীর সঙ্গে একটু গ্রাম্য রসিকতা করি, ওতে কান দিয়ো না। যখন এসেচ, সাতদীঘেয় কিছুদিন থেকে যেতে হবে। মনে হচ্চে বটে, দিদিমণি তোমাকে চেনে বলে বলেছিল।··· আমার দিদিমণি চেনে না, এমন সৎপাত্র ক'টা আছে!' বলিয়া বৃদ্ধ রাজশঙ্কর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'তোমার সঙ্গে আর যদি আমি কথা বলেচি।' ইলা কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে কহিল।

পনেরো

দ্বিপ্রহরের জনশূন্য ধূসর মাঠের দিকে আন্‌মনা চোখ উঠাইয়া প্রতিমা অনেকক্ষণই দাঁড়াইয়া রহিল। ফসলের শূন্যক্ষেত, গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের নির্জ্জীব কুটিরগুলি এবং আরো দূরে কারখানার চিম্‌নি এ-জানালা হইতে সহজেই নজরে পড়ে, কিন্তু ইহাদের কোনওটাই এখন প্রতিমার নজরে পড়িল না। দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে আরও দূরে, এক অজানা গ্রামের অপরিচিত অট্টালিকায় পরিচিত মানুষের সন্ধানে। এই উন্মনতার মধ্যে প্রতিমার সত্তা যেন ডুবিয়া গিয়াছে।

মধ্য-বৈশাখের প্রচণ্ড রুদ্র সূর্য্য অগ্নিবাণ হানিয়া তবে এই স্বপ্ন ভাঙিতে সক্ষম হইল। মুখের উপর কড়া রোদের ঝাঁজ পড়িতেই চমকাইয়া উঠিয়া প্রতিমা জানালা ত্যাগ করিল। কিন্তু তখনও সে যেন যথেষ্ট সচেতন হইয়া ওঠে নাই; মুখের আচ্ছন্ন ভাব অটুট রহিয়াছে। আফিম-খাওয়া পাখির মতো তাহার নিজের উপর তার যেন দখল নাই, স্বাধীনভাবে ভাবিবার ক্ষমতা নাই; তাহার আবেগের কাছে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে।

ড্রেসিং-টেবিলের কাছে মখমলের নিচু টুলটায় তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো প্রতিমা আসিয়া বসিল। আয়নার দিকে একবারও তাকাইল না; ডান দিকের ড্রয়ার খুলিয়া মুখ-খোলা বড়ো রঙিন খাম হইতে একটা চিঠি খুলিয়া লইল। ভোরেই এই চিঠিটা আসিয়াছিল; সাতদীঘি হইতে ইলার চিঠি। তারপর ইতিমধ্যে ইহা অন্তত বার চারেক পঠিত হইয়াছে। ইলা তার বন্ধু; তার চিঠি পাইতে ও পড়িতে প্রতিমার সর্ব্বদাই ভালো লাগিত। বহুদিন চিঠির আদান-প্রদান বন্ধ ছিল। সহসা ইলা চিঠি দিয়াছে।

খামের ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া প্রতিমা আবার চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিল।

'ভাই প্রতিমা, একমাসের কাছাকাছি হলো দাদুর কাছে সাতদীঘেয় এসেচি। বিলেত যাওয়া সম্পর্কে পাকাপাকি করে' যাব বলেই এসেছিলাম; বিলেত যাওয়ার প্যাসেজ জোগাড় হবে বলে ইতিপূর্ব্বেই আশ্বাস পেয়েচি। কিন্তু সব বুঝি গোলমাল হয়ে যায়!

দাদুর সঙ্গে গাজনের উৎসবের সময় কবি-গানের আসরে যাবার পথে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে তোর সঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক মুদির দোকানে এসে উঠেচেন শুনে হেসে আর বাঁচিনে। ধরে' বেঁধে দাদুর কাছে নিয়ে এলাম। তারপর অতিকষ্টে জমিদার-বাড়িতে নিয়ে এসেচি। যা একগুঁয়ে লোক, জানিস তো! রাজি করাতে হিমসিম খেতে হয়েচে।

তার কাছে সব কথা শুনলাম। তোদের মিলের প্রতিযোগিতায় গ্রাম-উন্নতির অমন একটা মূল্যবান এক্‌সপেরিমেণ্ট ভেস্তে গেল, এটা কম দুঃখের নয়। শত হোক, দেশে আর কটা মিল করা যাবে? বাঁচতে হলে সঞ্জীববাবুর পথই অনুসরণ করা চাই। যতই সঞ্জীববাবুর কথা শুনচি, সমস্যাটার কথা ভেবে দেখচি, ততই মনে হচ্চে, দেশকে বাঁচাবার জন্য আমাদের অনেক কিছু করবার আছে।

দাদুও ব্যাপারটাতে কৌতূহলী হয়ে উঠেচেন। তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেচেনই বলা চলে। সারাক্ষণ সঞ্জীববাবুর সঙ্গে আলোচনা করচেন। তাকে প্রশ্ন করে' অতিষ্ঠ করে তুলচেন। বলচেন, 'বাঃ, এত চমৎকার উপায়! সুন্দর ব্যবস্থা! কল-কারখানার ঝামেলা বাঁধিয়ে কোন্ লাভ! তুমি এখন কিছু দিন এখানেই থাকো, সঞ্জীব। এ রকম একটা গ্রাম-উন্নতি সঙ্ঘ এখানে গড়ে' দিয়ে যাও। ভয় নেই, এ জমিদার ভালো জমিদার, কল-কারখানার আমদানি করে' তোমাকে ভিটেছাড়া

করবে না!' বলে হো হো করে' হেসে ওঠেন। বগড দাদুর লেগেই আছে।

সত্যি কথা বলতে কি ভাই, আমিও খুব মেতে উঠেচি। দাদু বলেচেন, 'যদি বিলেত যাওয়ার বাসনা ছেড়ে সঞ্জীবের সঙ্গে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিস, তবে যত টাকা চাই দেব।' আমার বিলেত যাওয়া ওঁর পছন্দ নয়, তাই এই ঘুষ দেওয়া হচ্চে। আমিও ভাবচি, সত্যিই তো, বিদেশে গিয়ে বিদেশী ডিগ্রী এনে আমার কি লাভ হবে। তার চেয়ে দেশের গরিব-দুঃখীদের যদি কাজে লাগতে পারি, বাংলা দেশের গ্রামগুলিকে আবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুলতে পারি, তবে একটা কাজের মতো কাজ হয়।

মুস্কিল হয়েচে সঞ্জীববাবু নিজে। তার যেন কোনও উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। একেবারে যেন মুষড়ে পড়েচেন। দাদু বলেন, 'বড় মার খেয়েছে কিনা, তাই দমে গেচে। ক'দিন ওকে বিশ্রাম করতে দে, আদর-যত্ন কর, আবার ও উদ্যোগী হয়ে উঠবে, পুরুষ-সিংহ ক'দিন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে ?'

পড়া অসমাপ্ত রাখিয়াই চিঠিটা প্রতিমা আয়নার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

কত ন্যাকামিই ইলা করিতে পারে! দেশের গরিব দুঃখীর জন্য কত সব মাথা-ব্যথা! বাংলার গ্রামগুলির জন্য কত দরদ! একমাত্র দাদুকে খুসি রাখিবার জন্য ক্যাস্টর-অয়েল গেলার মতো ক'টা মাস তাকে গ্রামে বাস করিতে হয়, এ কি সে নিজের মুখেই প্রতিমাকে বলে নাই। নিজের সাজ-পোশাক, গয়না ও প্রসাধন, পার্টি ও পিক্‌নিক্ ছাড়া আর কিছুর কথা কি সে জীবনেও কখনও ভাবিয়াছে! লোকে ইলা সম্বন্ধে আরও কত কথা বলে, কিন্তু প্রতিমা তাহা বিশ্বাস করে না। করিলে দাদার সঙ্গে তার বিবাহের কথা উঠাইতে পারিত না। কিন্তু সে যে হাল্কা প্রজাপতি-মার্কা মেয়ে, ইহা তো প্রতিমার অজানা নয়। অকস্মাৎ এই মেয়েই এমন আদর্শ-

বাদী, দেশের উপকারে উৎসুক হইয়া উঠিল কেন? এত দিনের সঞ্চিত বিলাত যাওয়ার অভিলাষই বা ত্যাগ করিল কেন? একবার ন্যাকামি দেখ না, দাদু বলেচেন, কয়দিন ওকে বিশ্রাম করতে দে, আদর-যত্ন কর!...

সঞ্জীবের উপরও প্রতিমার প্রচণ্ড রাগ হইল। কিছু করিবার উৎসাহ নাই, তবে ওখানে শুধু শুধু পড়িয়া থাকা কেন? পৃথিবীর এত জায়গা থাকিতে সাতদীঘিতেই বা সে উপস্থিত হইল কি করিয়া? তবে কি আগে হইতেই ইলার সঙ্গে তাহার চিঠিপত্র চলিত? এই জোরেই কি সে তাহাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া জেদ করিয়া মিলের সঙ্গে টক্কর দিয়াছিল? একটা প্রচণ্ড অভিমানে প্রতিমা যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। পরাজয়ের ক্ষোভে তার সকল কিছু চুরমার করিয়া দিতে ইচ্ছা হইল।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়া যে টুল হইতে উঠিয়া পড়িল। কার্পেটটায় চটি আটকাইয়া যাওয়ায় এক লাথি মারিয়া কার্পেটটা উল্টাইয়া দিল। দরজার পর্দ্দা অনাবশ্যক জোরে সরাইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। চেঁচাইয়া রামু-বেয়ারাকে ডাকিয়া ধমকাইয়া কহিল, 'ড্রাইভার কোথায়? গাড়ি আনেনি কেন এখনও? চারটের সময় বোর্ডের মিটিং আছে, ক'বার তাকে বলতে হবে?'

ড্রাইভারের অপরাধে তাহাকে বকুনি খাইতে হইবে কেন, তাহা না বুঝিয়া রামু কর্ত্তব্যপালনে ছুটিল।

সন্ধ্যার অনেক পরে, বোর্ডের মিটিং সমাপ্ত হইবারও ঘণ্টা দুয়েক পর, মহিম এবং কেশব বাড়ি ফিরিল। ইতিপূর্ব্বেই প্রতিমা ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কোম্পানীর এত বড় সাফল্যের কোন খবরই ব্রজময়ী তখন পর্য্যন্ত পান নাই। মহিম ফিরিয়া আসিয়া তবে মাকে জানাইল।

ব্রজময়ী তাহার নিত্যকার প্রথামত খাটের উপর উঠিয়া সামনে রামায়ণ খুলিয়া বসিয়াছেন। মহিম ঘরে ঢুকিয়া তাহার পায়ে হাত

দিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'মা, আমাদের মিল দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে প্রথম বছরেই আমরা শতকরা বারো টাকা লাভ ঘোষণা করতে পেরেচি। ইতিমধ্যেই শেয়ার-বাজারে আমাদের মিলের শেয়ারের লেন-দেন হচ্চে, এই ডিভিডেণ্ড ঘোষণাব পর আমাদের শেয়ারের দাম আরও বেড়ে যাবে। রিজার্ভ ফণ্ডে যথেষ্ট টাকা রেখেও আমরা এই ডিভিডেণ্ড দিতে পেরেচি। আজ বোর্ডের মিটিঙে এসব মঞ্জুর হলো…'

ব্রজময়ীর মুখমণ্ডল পুত্রের সাফল্যে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধীব কণ্ঠে কহিলেন, 'হবে বাবা, আরও হবে। আরও তোদের উন্নতি হবে। তোরা সবাই কি মিলেব জন্য কম খেটেচিস ?'

'এই সাফল্যের অধিকাংশটাই,' মহিম কহিল, 'কেশবের উদ্যম এবং পরিশ্রমের ফল। সে একটা আস্ত ময-দানবের মতো খেটেচে, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করেনি, এক মুহূর্ত্ত ঢিলে দেয়নি, একবারও সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়নি। মিলের বয়লারের মতোই অবিশ্রান্ত শক্তিতে এগিয়ে গেচে। আমাদের এই সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি তার কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে।'

ব্রজময়ী একবার চোখ তুলিয়া তাহাব এই উদার-হৃদয় পুত্রটির দিকে চাহিলেন। এমন বন্ধুপ্রিয় লোক সত্যই বিরল। এই প্রচেষ্টার সকল সাফল্যের সকল গৌরব অন্য একজনকে এমন ভাবে আর কেহ দান করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এমন পুত্রের গর্ব্বে ব্রজময়ী যেন গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, 'হ্যাঁ, বড়ো ভালো ছেলে। তোকে সে কত শ্রদ্ধা করে। চমৎকাব ছেলে।…তবে এইবার তাকে আমার সেই কথাটা একবার বল, বাবা। প্রতিমাকে সে বিয়ে করুক। এতে সব দিক থেকেই স্থবিধে হবে। প্রতিমাও আমার কাছেই থাকতে পারবে, নইলে কোথায় কত দূরে তার…'

মহিম বিছানার একপাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'কেশব নিজেই

আমার কাছে আজ এই প্রস্তাব করেচে, মা। বোর্ডের মিটিঙের পরে দুজনে যখন বাড়ি ফিরচি, তখন সে বললে, "আপনার মিল দাঁড় করে' দিয়েচি, সাফল্যমণ্ডিত করেচি, এর জন্য আমি কি কোনও পুরস্কার দাবি করতে পারিনে, মহিম-দা?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, পার বৈ কি। বল কি চাই?" তখন সে খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বল্‌লে, "তবে আমাকে প্রতিমাকে বিয়ে করতে দিন। এর চেয়ে আর বড়ো পুরস্কার কল্পনা করতে পারিনে…" আমার নিজেরও মনে হয়, মা, কেশবের কর্ম্মকুশলতা দেখে প্রতিমা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে। আগে কেশবের প্রতি ওর ব্যবহারের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিরাগ ছিল। কিছুদিন হলো সেটা আর লক্ষ্য করছি না। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো, তারপর দরকার হয়, না হয় আমিও বলব এখন…'

'হ্যাঁ বাবা, মহিম। এ সবার পক্ষেই ভালো হবে। আজই ও-কে আমি বলব। আমি জোরই কবব। এইবার তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেলে আমি বাঁচি…'

'বিয়ে অবশ্য শ্রাবণের আগে হতে পারে না মা', মহিম কহিল। 'দুমাসের জন্য আমাকে বিলেতে যেতেই হবে, তোমাকে তো আগেই বলেচি। কতগুলি অত্যন্ত দরকারী কল-কব্জার অর্ডার দেওয়াই চাই। অবশ্য মেশিনারির আমি বিশেষ কিছু বুঝিনে, কেশব যেতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হতো, কিন্তু কারখানা ছেড়ে তার পক্ষে দু'মাস কেন, দুদিনও দূরে থাকার উপায় নেই।…সে যা হোক, কথা পাকাপাকি হয়ে থাকতে দোষ নেই। বরঞ্চ নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বিলেতে যেতে পারি। তারপব দুমাস পরে ফিরে এসে শ্রাবণেই বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে, কি বল?'

প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন থাকিলেও ব্রজময়ীর উৎসাহ যেন এক পর্দ্দা নামিয়া গেল। মুখ নিচু করিয়াই তিনি কহিলেন, 'তোর এই বিলেতে যাওয়াটা

আমার বড় পছন্দ নয়, বাবা। বিশেষ করে, এই এরোপ্লেনে উড়ে যাওয়া। কখন তার কল-কব্‌জা বিগ্‌ড়ে যায়, তার কি কিছু ঠিক আছে…'

মহিম সহাস্যে কহিল, 'জাহাজ সমুদ্রের লুকানো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়, মা ওলাইচণ্ডী উদরে প্রবেশ করেন, ক'টা তুমি আটকাবে! চিরকাল আঁচলের তলায় কি আর ঢেকে রাখতে পারবে! সুতরাং ও-চেষ্টা বৃথা। এরোপ্লেনে দু'দিনে বিলেত পৌছান যায়, এটাই বড়ো কথা। কিন্তু আমি যাই, প্রতিমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। তুমি ওকে রাজি করাও…'

ড্রইং-রুমের পি-আনোয় প্রতিমা যখন তার গান সমাপ্ত করিল, তখন কেশব তার চেয়ার হইতে উঠিয়া বিজয়ী বীরের গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে কহিল, 'আজ সত্যই বুঝতে পেরেচি, আমার পরিশ্রমের দাম আছে। এই গান আমার পুরস্কার। আরও একটা বড়, মহা বড় পুরস্কার দাবি করেচি, কিন্তু সেকথা আপনাকে এখন জানাব না। আগে সেটা উচ্চ বোর্ডে মঞ্জুর হয়ে আসুক…' বলিয়া কেশব উচ্চ হাস্য করিল।

বস্তুত, প্রতিমাকে তাহার প্রতি এতটা সদয় সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। আজ তাহার প্রতিটি অনুরোধ প্রতিমা সহজে এবং অবিশ্বাস্য মাধুর্য্যের সঙ্গে রক্ষা করিয়াছে, এবং যে-গান শুনিবার জন্য প্রায় যুদ্ধ করিতে হইত, সেই গান বলা-মাত্রই প্রতিমা শোনাইয়া দিয়াছে। ইহাকে কেশব তাহার সাফল্যের পুরস্কার, বিজয়ীর প্রতি সহজাত সম্মান বলিয়াই গণ্য করিয়াছে।

'আজ আমার পক্ষে সত্যই গৌরব এবং আনন্দের দিন', কেশব পি-আনোর টুলে-বসা প্রতিমার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'মহিম-দা এবং আপনি আমার উপর যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, আজ আমি তার উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে পেরেচি। আরও অনেক বড়ো, আরও ব্যাপক এবং দুঃসাহসী পরিকল্পনা আমার

আছে। ক্রমে সেগুলিরও রূপদান করতে চেষ্টা করব। একে এমন একটা বড়ো প্রতিষ্ঠান করে' গড়ে তুলতে চাই, সারা দেশ যার জন্য গর্ব্ব করতে পারে। ভাবতে পারেন, কোনও মিল কাজ আরম্ভের প্রথম বছরই বারো পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড্ ডিক্লেয়ার করেছে! ইণ্ডাস্ট্রির ইতিহাসে এটা প্রায় একটা চমক্‌প্রদ ঘটনা! শেয়ার-হোল্ডারেরা একে আশাতীত লাভ মনে করবে। এইবার আমাদের শেয়ার কত প্রিমিয়মে বিক্রি হয়, লক্ষ্য করবেন।...'

'মজুরদের আরও কিছু বোনাস্ দিলে কি ভালো হ'তো না!' প্রতিমা পি-আনোর ঘাটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল।

'আরো বোনাস্! না না।' কেশব সাতঙ্কে কহিল। 'অন্যান্য মিল সাধারণত যা দিয়ে থাকে তার বেশি দিতে গেলে অ্যাসোসিয়েশানে-চেম্বারে কথা উঠবে! মার্কেট্ খারাপ করা চলে না।...হ্যাঁ, তবে জানেন, আপনি মিটিং থেকে চলে আসার পর ওরা সব এসে ধরলে। শত হোক্, আজ মিলের পক্ষে একটা আনন্দ-উৎসবের দিন। মহিমদাকে বলায় উনিও রাজি হয়ে গেলেন। আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য আজ মজুরদের হাজার টাকা থোক্ দিয়ে দেওয়া হলো।...খাওয়ার পরে চলুন না আপনাতে-আমাতে-মহিমদাতে গাড়ি নিয়ে একবার বেরুই। একবার কুলিদের মাতামাতির নমুনাটা দেখবেন!...এই যে মহিমদা, আসুন। আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনার একটা ট্যুর প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেচি। রাতের খাওয়ার পর মজুর-বস্‌তিতে এই ট্যুর শুরু হবে...'

'কেন রে প্রতিমা, মাতাল দেখতে চাস্ নাকি?' বলিয়া মহিম আগাইয়া আসিয়া তাহার 'ডিভানে' আসন গ্রহণ করিয়া দু' তিনটা গদিকে চ্যাপ্‌টাইয়া দিল।

ষোল

বৈশাখ শেষ হইবার আগেই প্রতিমা ও কেশবের বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া গেল। আশীর্ব্বাদের পর মহিম নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, 'তুমি এতদিন আমার বন্ধু ছিলে কেশব, এইবার আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলে। যত শীগ্‌গির পারি আমি বিলেতের কাজ সেরে ফিরতে চেষ্টা করব, যাতে বিয়েটা মিটে যেতে বেশি দেরি না হয়। ইতিমধ্যে আমি সব কিছুর ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।...তবে, হ্যাঁ, দেরিতে খেতে এসে প্রতিমাকে চটিয়ে দিয়োনা যেন!' বলিয়া সে হাসিয়া উঠিয়া কেশবের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিল।

ইহার দিন দুই-তিন পর দমদমের বিমান-ঘাঁটি হইতে মহিম আকাশ-পথে বিলাতে পাড়ি দিলে। তাহার বাড়ি এবং কারখানা রক্ষণা-বেক্ষণের ভার বাড়ির ভাবী-জামাতার উপরই আসিয়া ন্যস্ত হইল।

কেশবের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। একেই তো সে কাজ-পাগ্‌লা লোক; নিজে খাটিয়া, অপরকে খাটাইয়া ব্যস্ততার একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলে। ইহার উপর আসিল তাহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি; প্রতিমাকে পাওয়ার পরম পুরস্কারের অঙ্গীকার। কৃতজ্ঞতায় এবং আরও কৃতিত্ব-প্রদর্শনের উৎসাহে সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানোর নূতনতর ব্যবস্থা করিল। নতুন শিফ্‌টের প্রবর্ত্তন করিল, মাত্রা-উর্দ্ধ কাজের জন্য নতুন পুরস্কারের ব্যবস্থা করিল, শ্রমিক-নিয়োগের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন করিয়া তুলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশি কাজ আদায়ের দিকে মনোযোগ দিল। কাজ চাই, কাজ চাই, আরও কাজ চাই। বর্দ্ধিত

হারে ওভার-টাইম্ মিলিবে, বর্দ্ধিত হারে রেশন মিলিবে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি খাটিতে ভয় পাইলে চলিবে না। সমস্ত কারখানাকেই একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মতো নির্ভুল ও অক্লান্ত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। প্রতি সপ্তাহের উৎপাদনের অঙ্ক পূর্ব্বের সপ্তাহের চেয়ে বাড়িয়া যাওয়া চাই। একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম হইতে উর্দ্ধতম যে পরিমাণ উৎপাদন আশা করা সম্ভব, তাহার সবটা আদায় করিয়া কেশব তাহার নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মাতিয়া উঠিল।

কারখানায় নিজের অফিস-ঘরের সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার সম্মুখে বসিয়া কেশব যেন একই সময়ে পাঁচজন হইয়া উঠিয়াছে। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক ঘড়ির নীল রঙের কাঁটা সন্ধ্যা সাতটারও মিনিট সাতেক ওদিকে সরিয়া গেছে, কিন্তু কেশবের ব্যস্ততা সামান্যও শ্লথ হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন টেলিফোন-রিসিভার সজোরে তুলিয়া বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে সে আদেশ এবং উপদেশ পাঠাইতেছে। উল্টো দিকে এইচ, এম, ভি-র কুকুরের মতো অনুগত অপেক্ষমান স্টেনোগ্রাফার ছোক্‌রাকে একই সঙ্গে ডিক্টেশন-দান চলিতেছে। ইহারই মধ্যে পাশের র‍্যাক্ হইতে ফিতা-বাঁধা বিভিন্ন ফাইল টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া কেশব যেন পলকে তাহার মর্ম্মার্থ উদ্ধার করিয়া লইতেছে। গর্জ্জমান বয়লারটার মতো তাহার কাজেরও বিরাম নাই। একে ধম্‌কাইতেছে, ওকে সচিৎকারে উপদেশ দিতেছে,এবং স্পষ্ট তীক্ষ্ণ উচ্চারণে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ডিক্টেশন আওড়াইয়া যাইতেছে।

'কি লিখেচ, পড়ো দেখি,' একটা টেলিফোন-রিসিভার নির্দ্দয়ভাবে আধার পুনঃস্থাপিত করিয়া কেশব স্টেনোর দিকে চোখ তুলিল। 'এক হপ্তার মধ্যে ওদের মাল প্রস্তুত হয়ে যাবে, লিখচে? আচ্ছা বেশ, এইবার

লেখো…ওঃফ্, এরা আমাকে এক মুহূর্ত্ত শান্তিতে কাজ করতে দেবেনা… হোয়ট্! ইউ এগেইন, টমসন! আবার কি ব্যাপার?…ওয়েল…'

কাচের ঠেলা-দরজা ঠেলিয়া ওয়ার্কস-ম্যানেজার টমসন ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কেশব যেন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। একই কথা লইয়া বারবার তাকে জ্বালাতন হইতে হইলে এমন মোটা মাহিনার ওয়ার্কস-ম্যানেজার রাখিয়া লাভ কি? খুঁটিনাটি লইয়া তাহাকে বিব্রত হইতে হইলে কারখানা-সম্পর্কীয় বৃহত্তর পরিকল্পনার দিকে নজর দিবার উপায় কি?

টমসন জাতিতে স্কচ্। বহুদিন ধরিয়াই ভারতবর্ষে আছে, এবং বস্ত্র-শিল্পের সঙ্গেই জড়িত আছে। বেঁটে এবং খুব মোটা দেখিতে। গালের মাংসপেশী চোখ দুটিকে চাপা দিয়া প্রায় বুজাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। মুখ দেখিয়া সে কি ভাবিতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই; সর্ব্বক্ষণই স্মিত হাস্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়, কোন অবস্থাতেই ইহার পরিবর্ত্তন হয় না।

স্টেনোগ্রাফারের পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া মুখ হইতে মোটা চুরুটটা বাঁ হাতে স্থানান্তরিত করিয়া সে তাহার অচ্ছেদ্য স্মিতহাস্য সহকারেই কহিল, 'এই শিফ্‌টাকে কিছুতেই আমি ওভার-টাইম খাটবার জন্য রাজি করতে পারচিনা…'

'ওভারটাইম দ্বিগুণ হারে দেওয়া হবে বলেচ?' কেশব অধৈর্য্য হইয়া কহিল।

'তা বলেচি। তাতেও রাজি নয়। ওরা বলচে…'

'হ্যাং, ওরা কি বলচে।' কেশব চেঁচাইয়া কহিল। 'করতেই হবে, দে মাস্ট্। এই হপ্তার মধ্যে এ কাজ শেষ হওয়া চাই। আমি পার্টিকে প্রমিস্ করেচি। এ হতেই হবে। ওয়ার্কারদের সাধারণ রেটের ডবল পারিশ্রমিক দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু কাজ তাদের করতেই

হবে। জরুরি প্রডাকৃশনের টেম্পোর সঙ্গে তাদের মানিয়ে চলতেই হবে, কোনও আপত্তি আমি শুনব না।'

ওয়ার্কস-ম্যানেজার টমসন তাহার মুখের স্মিত-হাস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কহিল, 'ওরা বলচে, "আমরা এ সপ্তাহে এর মধ্যে চার চার দিন ওভারটাইম খেটেচি, আর খাটলে পড়ে যাব। শরীরে আর খাটুনি সইবে না, তা ডবল ওভার-টাইম দাও আর তিন ডবলই…'

'হোয়ট্ ননসেন্স!' কেশব টেবিলের উপর একটা অসহিষ্ণু ঘুষি বসাইয়া দিয়া কহিল, 'আমি নিজেও ওভারটাইম খাটচি, আমি নিজে আরাম করে' বসে নেই। পড়ে যাব! শরীরে সইবে না! যত সব বদ্‌মাসি। আহ্লাদে ছেলের আহ্লাদপনা হচ্চে! এ চলবে না, কিছুতেই চলবে না। ওদের বলো গিয়ে টমসন, তিন ধমক দিয়ে বলো গিয়ে, এ কারখানায় থাকতে হলে তাদের ওভারটাইম খাটতেই হবে; কারখানার প্রয়োজনে বাড়্‌তি খাটুনিতে আপত্তি করা আমি সহ্য করব না। না পারে, লেট্ দেম্ ক্লীয়ার আউট্। আমার কারখানায় আল্‌সে অপদার্থ লোকের জায়গা নেই…'

'বেশি চাপ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা, ভালো করে ভেবে দেখুন,' টমসন-সাহেব তাহার চোখের দৃষ্টিটাকে গালের মাংসপেশীর আড়াল হইতে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন। 'ইতিমধ্যে লেবার-লীডারেরা এসে নানা রকম দুষ্ট পরামর্শ দিচ্চে। আমরা যদি বেশি জোরাজুরি করি, তবে ভগবান জানেন, তার কি ফল হবে।'

শ্রমিক-নেতাদের আনাগোনার খবর কেশবের অজানা নাই, কিন্তু তাহাদের নামোল্লেখে সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। কহিল, 'লেবার-লীডার! হ্যাং দেম্ অল্। কি অধিকার আছে ওদের আমার এবং আমার শ্রমিকদের মধ্যে এসে দাঁড়াবার। এ আমি সহ্য করব না। বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করব না।…আমি আমার ওয়ার্কারদের ভাল

হারে, এমন কি মার্কেট-রেটের চেয়ে উঁচু হারে মাইনে দিইনে কি? এর প্রতিদানে আমি আশা করি কর্ম্মদক্ষতা, কর্ত্তব্যের প্রতি এবং কারখানার প্রতি আনুগত্য।...বলো গিয়ে তাদের, আমি কাজ চাই, ওভারটাইম তাদের খাটতেই হবে। এ আমার হুকুম। রাতের খাওয়ার জন্য তারা আজ বিশেষ অ্যালাউয়েন্স পাবে, কিন্তু বাড়ি যাওয়া চলবে না, কিছুতেই চলবে না। এ বিষয়ে যেন আমাকে আর মাথা না ঘামাতে হয়...'

কিন্তু কেশব যতই কাজের গতি বৃদ্ধি করিয়া চলিল, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ততই ছড়াইয়া পড়িল। ইহাদের অধিকাংশই গ্রামের চাষী-শ্রেণীর লোক। ধীরে-সুস্থে কাজ করাতেই ইহারা অভ্যস্ত। কারখানার ধরা-বাঁধা নিয়ম একেই তো ইহাদের মনঃপূত নয়, তারপর এমন তাড়া, ডবল-তিনগুণ কাজের এমন দাবির সঙ্গে ইহারা মানাইয়া চলিতে পারে না। কেশব শ্রমিকদের ভালো পারিশ্রমিক দেয়, কেহ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তাহার উন্নতির ব্যবস্থা করে, বাড়্‌তি খাটাইলে উদারভাবে পারিশ্রমিক দিয়া থাকে। কিন্তু সে যেন চাবুক লইয়া ঘোড়-দৌড় করায়। থামিবার উপায় নাই। ঢিলা দিবার উপায় নাই। তবেই শাসনের চাবুক আসিয়া পিঠে পড়িবে।

এই তাড়া ইহাদের ক্রমে যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। শহর হইতে শ্রমিক-নেতারা আসিল। শ্রমিকদের পরামর্শ দিল; নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন করিল। ইহার ফলে একটা য়ুনিয়ন গঠিত হইল; কিন্তু কেশব তাহাকে কোনও পাত্তাই দিল না।

মহিম বিলাত যাওয়ার পর এক মাসের উপর হইয়াছে। এই অল্প সময়ে উৎপাদনের হার আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গেছে। কেশব যেন তার দায়িত্ব অবিশ্বাস্য নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সঙ্গে পালন করিয়া মহিমকে একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিতে চায়। এই কাজের ঘোরে খাওয়ার দেরি করিয়া

প্রতিমাকে না চটাইবার যে উপদেশ মহিম হাসিচ্ছলে দিয়া গিয়াছিল তাহাও অহরহ লঙ্ঘণ করা হইতেছে।

আজও বেলা একটার উপর হইয়াছে, অথচ কেশব কিছুতেই হাতের কাজ শেষ করিতে পারিতেছেনা। অজস্র দলিল এবং ব্লু-প্রিণ্ট্ তার সারা টেবিল ভরিয়া মেলা। স্লিপ্-কাগজে পেন্সিল দিয়া নানা হিসাব চলিতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে টেলিফোন-রিসিভার তুলিয়া খবর সংগ্রহ হইতেছে। অথচ খাইতে যাওয়ার কথাটা সে ভোলে নাই; পেছনের ঘড়িটার দিকে বারবার চাহিয়া দেখিয়া সে যেন প্রতিমার বিরক্তির পরিমাণ আঁচ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ফলে তার কাজ সারিবার ব্যস্ততা যেন আরও বাড়িয়া গেল।

'হুজুর।'

স্লিপের অঙ্কটা অসমাপ্ত রাখিয়া চম্‌কাইয়া কেশব মুখ উঠাইল। দরজার প্রায় কাছাকাছি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী যশোদানন্দন যেন কাছে আসিতে ভয় পাইতেছে এমনই জড়োসড়ো ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সারা গাল খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভর্ত্তি, গায়ের নীল কাপড়ের হাত-কাটা শার্টটা ধূলায় এবং অতিব্যবহারে জীর্ণ এবং নোংরা। মুখে কাতরতাই বেশি অথবা ভয়ই বেশি তাহা বলা কঠিন। তাহাঁর বিপন্ন অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহার প্রৌঢ়ত্ব যেন দরজা ভাঙিয়া বার্দ্ধক্যে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

'কি চাই এখানে,' কেশব গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'কি চাই? আমার ঘরটা দেখি বৈঠকখানা হয়ে উঠেচে, যার খুসি ঢুকে পড়লেই হলো! কাজ করচি দেখতে পাওনা? কোনও কথা শোনবার আমার সময় নেই···যাও···'

যশোদা এক সেকেণ্ড দ্বিধা করিল, যেন কর্ত্তব্য ভাবিয়া লইতেছে অথবা সাহস সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু বাহির না হইয়া বরঞ্চ সে আরও কয় পা

আগাইয়া আসিল। কহিল, 'হুজুর বাপ-মা, অনুপায় হয়েই হুজুরের কাচে এইছি।...আজ্ঞে ফোরম্যান্ এসে বল্লে, আমার বাড়ি যাওয়া নিষেধ হয়ে গেচে। বড় অবিশ্বেস হলো। ছোট সাহেবের কাছে গেলুম। ছোট ছেলেটা মিত্যু শয্যেয়, ছুটি দিয়ে ছুটি বাতিল হবে, এও পেত্যয় হয়! তা শুনলাম, হুজুর নাকি নিজে হুকুম করেচেন। শুনে বিশ্বেস হলো না...'

'তাই আমার কাছে সঠিক জানতে এসেচ, কেমন!' তিক্তভাবে কেশব কহিল। 'হ্যাঁ, আমার। আমারই হুকুম। ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে কি উপকারটা তুমি করবে শুনি? অসুস্থ ছেলের বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে' নাকে ফোঁস্‌ফোঁসালে তার ব্যারাম ভালো হয়ে উঠবে? তোমার বাড়ি যাওয়ার কোনও মানে হয় না। পাঠিয়ে দাও কারখানার ডাক্তারবাবুকে। সে তোমার চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে।...এই তাকে আমি টেলিফোন করে' দিচ্ছি।...কিন্তু খবরদার, আর এক মিনিটও নয়। নিজের কাজে ফিরে যাও, আমাকেও কাজ করতে দাও। কাজের জগতে তোমার এসব বাজে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ভালোবাসার জায়গা নেই...' বলিয়া কেশব টেলিফোন উঠাইল।

'হুজুর।'

'গেট্ আউট্, ইউ সোয়াইন্।' কেশব গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'খালি খালি দাঁড়িয়ে বকতে থাকবে। কথা কানে যায়নি? তুমি তোমার ছেলের উপর ঝুঁকে বসে থাকতে চাও বলে আমি সারা ফ্যাক্টরির কাজে ওলোট-পালোট হতে দিতে পারি নে। কাজে যাও। শুনতে পাচ্ছ না কথা, কাজে যাও।'

যশোদা আর প্রতিবাদ করিবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারিল না, মার-খাওয়া কুকুরের মতো প্রায় লেজ গুটাইয়া তিনবার হোঁচট খাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেশব বার কয়েক বিরক্তিভরে 'ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্' বলিয়া একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, তারপর টেলিফোন-

রিসিভারে ডাক্তারকে ডাকিয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়া টেবিলের কাগজগুলির উপর ঝুঁকিল।

'হুজুর !'

'উঃফ্, অসহ্য, অসহ্য', বলিয়া কাগজপত্রের উপর একটা চাপড় দিয়া একটা জ্বলন্তদৃষ্টি দরজার কাছে প্রেরণ করিয়া কেশব বিদ্যুত-মিস্ত্রী যশোদা-নন্দনের খোঁজ করিল। কিন্তু যশোদা নহে। লেবার-য়ুনিয়নের অন্যতম পাণ্ডা বিশ্বম্ভর।

কামারের ব্যবসা ছাড়িয়া গ্রামের অন্যান্যদের মতো সে-ও ইচ্ছায় না হউক অনিচ্ছায় কারখানার মজুর বনিয়াছে। দক্ষ কারিগরের মধ্যে তার জায়গা হইয়াছে, সাধারণ মজুরদের তিনগুণ তার আয়। বেচারি কিন্তু কিছুতেই কারখানার নিয়মকানুন, শাসন-অনুশাসনের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে নাই। য়ুনিয়ন প্রতিষ্ঠার আগে হইতেই গজর্ গজর্ করিতেছে, ঘোঁট পাকাইতেছে, ইহার উহার সাথে ঝগড়া বাঁধাইয়া বসিতেছে। য়ুনিয়ন প্রতিষ্ঠায় সে অগ্রণী হইল। স্বাধীনতায় অভ্যস্ত লোক স্বাধীনতা হারাইলে যেমন অস্থির হইয়া ওঠে, মজুরদলে ভর্তি হইবার পর সে-ও তেমনি ছট্‌ফট্ করিতেছিল। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুযোগ সে ব্যগ্রভাবে আঁকড়াইয়া ধরিল, নহিলে য়ুনিয়নের অন্য সার্থকতা সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বোঝে না। যাহা হউক, তাহার প্রবল উৎসাহ ও প্রচণ্ড জীবনীশক্তি য়ুনিয়নের গঠন-অবস্থায় বড়ো কাজে লাগিতেছে। বিশ্বম্ভরও মাতিয়া উঠিয়াছে।

'কি চাও, কি চাও এখানে ?' কেশব তাহাকে দেখা মাত্রই জ্বলিয়া উঠিল। 'কোনও কথা নয়। সোজা বেরিয়ে যাও।...শোন, তুমিই ভূয়ো য়ুনিয়নের একজন পাণ্ডা না ? কারখানার নুন খেয়ে কারখানার মজুর ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছ। আমি তোমাকে খুব চিনে রেখেচি...'

'হুজুর ঠিকই চিনেচেন।' বিশ্বম্ভর বিনীত ভাবেই কহিল। 'আজ্ঞে

আমি এসেচি হুজুরের কাছে দয়াধর্ম্মের নামে আবেদন জানাতে। ইলেকট্রিক-মিস্ত্রী যশোদাকে ছুটি দিয়ে দিন হুজুর। ওর ছেলেটা বাঁচে কি মরে ঠিক নেই...'

'সব বড় বড় বস্তি এসেচেন, বাঁচে কি মরে ঠিক নেই!' কেশব বিরক্ত হইয়া কহিল। 'সে ছুটি পায় কি না পায়, তুমি তাতে নাক-গলাতে আসবে কেন শুনি? ছুটি দিন! সে বাড়ি গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলে ছেলের কি উপকারটা হবে, জিজ্ঞেস করি? এই কাজের তাড়ার মধ্যে একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে আমি মিছিমিছি কামাই করতে দিতে পারিনে, কিছুতেই দিতে পারিনে। তাতে সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম ভেস্তে যাবে, উৎপাদনের হার...'

'উৎপাদনের হার আপনার কাজে লাগে, হুজুর। অসুস্থ ছেলের বাপের উদ্বেগের তাতে কোনও শাস্তি হয় না।' অতি নিরীহভাবে অনুত্তেজিত ভঙ্গিতেই কথাগুলি বলা, কিন্তু ইহার কাঠিন্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশই নাই।

কেশব চোখ তুলিয়া বিশ্বম্ভরের নির্ব্বিকার মুখের দিকে চাহিল। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, 'ওঃ, তুমি দেখচি সমস্ত বড়ো লেবার-লীডার হয়ে উঠেচ! উৎপাদনের হার শুধু আমারই কাজে লাগে! কোথা থেকে তোমার মাইনেটা আসে শুনি? কোথা থেকে ভাতা আসে, বোনাস্ আসে, কোথা থেকে ডাক্তার আসে, ডাক্তারখানার বিনে পয়সার ওষুধ আসে? ছেলেপিলেদের অবৈতনিক শিক্ষার পয়সা কোথা থেকে জোগাড় হয়?...'

'আজ্ঞে সে কথা যখন তুললেন,' বিশ্বম্ভরও না দমিয়া কহিল, 'তখন আমিও দু'চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি। মজুরদের পাকা বাড়ি, পাকা কুয়োর পায়খানার কি হলো, খেলাধূলোর পার্কের কি হলো, কারখানায় ক্যান্টিন খোলার কি হলো? গত বচরের লাভ থেকে

শতকরা বারো টাকা অংশীদারদের বেঁটে দিয়েছেন, রিজার্ভ ফণ্ডে এস্তার টাকা তুলে রাখলেন, আমাদের মজুরদের কত বোনাস্ দিলেন শুনি? বচর শেষে ঐ ক'টি টাকার জন্যই কি আমরা মুখে রক্ত তুলে খাটলুম? এই যে তাড়া দিয়ে আমাদের কাছ থেকে ঘানিতে সর্ষে ভাঙার মতো কাজ টেনে বার করচেন…'

কেশবের আর সহ্য হইল না। সামান্য একটা মিস্ত্রীর এই ধৃষ্টতা অবিশ্বাস্য বোধ হইল। হাতের পেন্সিলটা দুরন্ত ক্রোধে বিশ্বম্ভরের দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'গেট্ আউট্, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও! ইম্পার্টিনেণ্ট সোয়াইন! আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেচ। আই উইল শুট্ ইউ, শুট্ ইউ লাইক্ এ ডগ্…'

বিশ্বম্ভর আর কোনও কথা বলিল না। কেশবের চোখের দিকে এক সেকেণ্ডের জন্য তাকাইয়া মাটি হইতে পেন্সিলটা কুড়াইয়া লইল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া সাড়ম্বরে পেন্সিলটা তার কুর্ত্তার উপর-পকেটে পুরিয়া লইয়া বেশ একটু বেপরোয়াভাবেই সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পিছনের ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া দুইবার বাজিয়া জানাইল—বেলা দুইটা। একটানে টেবিলভরা কাগজ এক দিকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া কেশব কলিং-বেলের ঘণ্টিতে কয়েকটা ঘুষি মারিল, এবং উর্দ্দিপরা চাপরাসী ছুটিয়া আসিতেই তাহার দিকে না চাহিয়া আদেশ দিল, 'গাড়ি।'

সতেরো

সাতদীঘির জমিদারবাড়িতে দেখিতে দেখিতে সঞ্জীবের মাস দেড়েক কাটিয়া গেল। রাজশঙ্কর রায় জেদ ধরিয়া বসিয়াছেন, দশার্ণপুর গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের আদর্শে তিনিও সাতদীঘিতে সমবায়-প্রতিষ্ঠান গড়িবেন; সঞ্জীবকে এখানে কিছুদিন অন্তত থাকিয়া সেটাকে গড়িয়া দিয়া যাইতে হইবে। এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় এবং উদ্যোগে বুড়া জমিদার খুব মাতিয়া উঠিয়াছেন।

সঞ্জীব বৃদ্ধকে ক্ষুণ্ন করিতে কষ্ট বোধ করে, কিন্তু ইহাতে সহায়তা করিতে সে কোনও উৎসাহ বোধ করে না। তবু তাকে থাকিতে হইয়াছে, উপদেশ দিতে হইতেছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কত সহজেই তাহার এত পরিশ্রমের, এত স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটি তাসের ঘরের মতো চুরমার হইয়া গেল! কত আশা করিয়া, কত আত্ম-ত্যাগ করিয়া কি ভঙ্গুর জিনিষই না সে তৈরি করিয়াছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কি করিয়া সে অস্বীকার করিবে যে, ধনোৎপাদনের কুশল-তায় কলের সঙ্গে হাত কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, প্রতিযোগি-তায় হারিয়া সঞ্জীবের নিজের মতো পলায়ন করিবে। কলের যত দোষই থাকুক, তাহার উৎপাদন-দক্ষতা তাহার সকল ত্রুটি ডুবাইয়া দেয়, মানুষকে আকর্ষণ করে। কারখানাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। নিজের কৃতিত্বে ইহা নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে।

অবশ্য কুটির-শিল্পকে যে কলের প্রতিযোগী হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ইহাকে কারখানার পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। কিন্তু সঞ্জীব এক সময় কারখানাকে সর্ব্বনাশকর মনে

করিয়াই দূরে পালাইয়া আসিয়াছিল, কুটির-শিল্পকে শান্তি ও সুখের আকর বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। এখন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়াই সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, প্রতিযোগিতার যুগে অর্থনৈতিক জীবনের অত সোজা-সরল ব্যবস্থা সম্ভব নয়; কলকারখানা যত জটিলতার সৃষ্টিই করুক না কেন, মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা তার অপরিসীম। রূঢ় সত্যকে আর সে অস্বীকার করিতে পারে না। এজন্যই তাহার মনে একটা বড় রকম দ্বিধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজশঙ্কর রায়ের প্রশ্নের সে যথাযথ জবাব দেয়, খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা জানাইতে কার্পণ্য করে না, সমবায়ের নিয়মকানুন সবই সে বলিয়া দেয়। কিন্তু তার বেশি নয়। এমন একটা সুযোগ পাইয়াও তাহার আদর্শের নতুন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার মতো উৎসাহ আর তার নাই।

কিছুদিন ধরিয়াই সে যাইবার অনুমতি চাহিতেছে। কিন্তু রাজশঙ্কর এ-কথা কানেই তোলেন না। বলেন, 'তোমাকে উপলক্ষ্য করে' এত বড় একটা ব্যাপারে পা বাড়িয়েচি, তুমি কাছে না থাকলে চলবে কেন? পদে পদে যে তোমার পরামর্শ চাই। সেটি হবে না, বাবা। অন্তত সঙ্ঘে কাজ শুরু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে থেকে যেতেই হবে। চলে যাব বললেই কি যাওয়া চলে। আর শুধু কি আমি; ইলাদিদিই বা তোমাকে ছাড়বে কেন? তোমার সঙ্গে মিলে কাজ করবে বলেই যে সে বিলেত-যাবার বায়নাটা মুলতুবি রেখেচে। তুমি কি আমার এ-কূল ও-কূল দুকূলই ভেঙে দিতে চাও?…' বলিয়া বৃদ্ধ একটা দুষ্টু হাসি দ্রুত গিলিয়া ফেলিলেন।

ইলা দিদি! ইলাদিদি সঞ্জীবের আরেকটি আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। একে তো ইলার হাল্কা এবং উচ্ছ্বাসময় ভাবটা সঞ্জীবের প্রথমাবধিই ভালো লাগে নাই, তার উপর আজকাল এই ভাবী সমবায়-প্রতিষ্ঠানের সূত্র ধরিয়া সে অনাবশ্যক অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন করিতেছে।

ইলা নিজেও আকার-ইঙ্গিতে বহুবার জানাইয়াছে যে, সঞ্জীবের সঙ্গে কাজ করিতে পারিবে বলিয়াই সে বিলেত যাওয়ার মতো এত বড় সৌভাগ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে।

সর্ব্বক্ষণ ইলা তাহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া ফেরে। গল্প-গুজবে, হাসি-মস্করায় সারাক্ষণ সে লীলায়িত। প্রতিষ্ঠান-গঠন সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যপথে উৎসাহভরে একাধিক দিন সে সঞ্জীবের হাত নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র ক'দিন আগে হাসির আবেগে সে সঞ্জীবের কাঁধে মাথা রাখিয়া তবে আত্মস্থ হয়। দারিদ্র্য-দূরীকরণে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সে সঞ্জীবের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলোচনা করে, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াগুলি গ্রামবাসীদের পক্ষে খুব ব্যয়সাধ্য হইবে কিনা, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে অতিথি-সৎকারের ত্রুটিহীন ব্যবস্থা চলিতেছে। বৈঠক-খানা দালানের যে অংশে বিশিষ্ট অতিথিদের শয়ন-ঘরগুলি, সেখানে সঞ্জীবের জন্য দুটি ঘরের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকর মোতায়েন আছে। খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বরে সঞ্জীব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত গণেশ সামন্তও এই আদরের ভাগ পাইতেছিল। কিন্তু বেচারির ইহা সহ্য হইল না। এই সোনার খাঁচায় বাঁধা পড়িয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। একদিন চুপে চুপে আসিয়া কহিল, 'আর নয়, দা'ঠাকুর। আসুন, একদিন চুপে চুপে বেরিয়ে পড়ি। আমরা হলাম বেনো জল, এই বাঁধানো দীঘি কি আমাদের জন্যে। পথে পথে যে মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে আছে, তুচ্ছ আরাম আঁক্‌ড়ে পড়ে' থাকব কোন্ দুঃখে!'

সঞ্জীবও হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। যাইতে পারিলে সে-ও বাঁচে। কিন্তু যাইবার উপায় কি?

সঞ্জীব খদ্দর পরে, পাঁচ গ্রাম খুঁজিয়া মিহি খদ্দর সংগ্রহ হইতেছে। সঞ্জীব বই পড়িতে ভালোবাসে, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা হইতে বইয়ের পার্সেল আসিতেছে। সঞ্জীব হৈ-চৈ চেঁচামেচি পছন্দ করে না। তার ঘরের কাছাকাছি লোকজনের আনাগোনা নিষেধ হইয়াছে।

রাজশঙ্কর রায় তাহাকে ছাড়িবেন না, ইলা তাহাকে ছাড়িবে না।

অবশেষে একদিন অধৈর্য্য সামন্তমশায় সঞ্জীবের কাছে বিদায় লইয়া একলাই 'মণি-মাণিক্যে'র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। ভরসা দিয়া গেল, দু এক মাসের মধ্যে সে আবার আসিয়া মিলিত হইবে। সঞ্জীবের যাওয়ার কিছু ঠিক নাই। সে আর গণেশ সামন্তকে আটকাইবার চেষ্টা করিল না।

রাত প্রায় বারোটা। খাটের পাশের হাল্কা ঈজিচেয়ারটায় হেলান দিয়া, বাড়ির নিজস্ব ডায়নামো-পরিবেশিত বিদ্যুতের আলোয় সঞ্জীব বই পড়িতেছিল। রাত প্রায় দশটায় আহারের পর রাজশঙ্কর শুইতে যান। খাসকাম্‌রায় আরও পাঁচ-দশ মিনিট গল্প-গুজবের পর ইলা সঞ্জীবকে চাকরের হেপাজতে বৈঠকখানা বাড়িতে শুইতে পাঠায়। পথ-ভুল করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহাই জমিদার বাড়ির আদব।

নিজের শয়নঘরে আসিয়া ঈজিচেয়ারের পাশের ছোট টিপয়টায় গোটা কয়েক নতুন বই দেখিয়া সঞ্জীব আকৃষ্ট হয়। দু-চার পাতা উল্টাইয়া বইটি বড়ো ভালো লাগিয়া গেল। জনৈক ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদীর লেখা বই। লেখক সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার কারখানা-জীবন সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা ও বুদ্ধিমান মন্তব্যে বইটি চিত্তাকর্ষক। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন: "এই কারখানাগুলি যতই দেখিয়াছি, ততই মুগ্ধ হইয়াছি। মজুরদের জন্য যে সকল সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহাদের বেতনের হার যে-রীতিতে নির্দ্ধারিত হয় এবং যে মনোভাব লইয়া

শ্রমিকেরা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে তৎপর, তাহা সকলই আমাদের কাছে অভিনব। আমাদের দেশের যে সকল ব্যক্তি কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিবেচনা না করিয়া কারখানা মাত্রকেই নারকীয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যাহারা ইহাকে একমাত্র নিজেদের মুনাফা বাড়াইবার কৌশল বলিয়া বিবেচনা করেন, উভয় দলই সোভিয়েট কারখানা হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষে, দানব কল-কারখানা নয়, দানব মানুষের স্বার্থপরতা। অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া যেখানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শ্রমশিল্পের সকল মুনাফা হস্তগত করিতে চাহে, কারখানা সেখানেই অসুন্দর এবং ক্ষতিকর আকার ধারণ করে। জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে কল-কারখানা কতটা মানব-হিত করিতে পারে, রাশিয়ার কারখানা সমূহে তাহার প্রমাণ দেখিয়া আসিলাম…”

ঠক্, ঠক্, ঠক্,। পিছনের অপরিসর দরজাটায় স্পষ্ট কয়েকটা টোকা পড়িল। সঞ্জীবের চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল। বিস্মিত ভাবে সে দরজার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া অপেক্ষা করিল। না, ভুল করে নাই। আবার শব্দ হইল, ঠক্, ঠক্ ঠক্। খুব জোরে নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট।

এ দরজা প্রায় কখনই খোলা হয় না। সঞ্জীব নিজে একদিন দরজাটা খুলিয়াছিল। -অন্দরের সব্জি-বাগানটা প্রায় নিচের সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির হইয়াছে। দূরে ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা আস্তর-খসা খিড়কির পুকুর-ঘাট। অন্তঃপুরের সান্নিধ্যের কথা ভাবিয়াই বোধহয় এ দরজাটা বন্ধ রাখা হয়।

ভারি বিস্মিত হইয়া সঞ্জীব চেয়ার হইতে উঠিল।

‘কে?’ বলিয়া সঞ্জীব দরজার ছিটকিনি খুলিল।

‘আমি।’ ড্রেসিং-গাউন পরা আলুলায়িত-কুন্তলা, রক্তবিম্বাধরা ইলা সঞ্জীবকে দরজার মুখ হইতে প্রায় ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে ঢুকিল।

'ব্যাপার কি?' সঞ্জীবের কণ্ঠে প্রভূত বিস্ময়।

'আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ আছে।' ইলা বই-রাখা টিপয়ের কাছে আগাইয়া গেল। 'আজই সেরে ফেলা চাই। আমারও ঘুম আসছিল না, আপনার ঘরেও দেখলুম আলো জ্বলচে। ভাবলাম, দরকারটা সেরেই আসি।...আপনার চেয়ারটা বে-দখল করলুম।' বলিয়া ইলা সহাস্যমুখে সঞ্জীবের ঈজিচেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

সঞ্জীব দু-পা আগাইয়া আসিল। কহিল, 'দেখুন ইলাদেবী, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি আজ শুতে যান। কাল সকালে প্রথমেই...'

'ঠিক আছে। আপনি বিছানাটায় বসুন।' ইলা সঞ্জীবের আপত্তি কানে না তুলিয়া কহিল। 'আপনারা পুরুষেরা চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে কিছুই দেখতে চান না। নইলে অনায়াসেই বুঝতে পারতেন, ইতিমধ্যেই আমি কতটা ত্যাগ স্বীকার করেচি। বিলাত যাওয়া আমার বহু দিনের কামনা। তার সুযোগও উপস্থিত। প্যাসেজ্ বুক্ করার কালই শেষ দিন, কালই টাকা জমা দেওয়া চাই। আজই আমাকে যাওয়া না-যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত করে ফেলতে হবে। কিন্তু কিসের প্রত্যাশায় এত দিনের স্বপ্ন বিসর্জ্জন দেব। প্রতিদানে কি পাব? এ সবই এই মুহূর্ত্তে আমাকে ভেবে দেখতে হবে। বলুন, আপনিই বলুন, কি প্রতিদান পাব?' বলিয়া ইলা মায়াবিনীর প্রগল্‌ভ দৃষ্টি সঞ্জীবের মুখের উপর ন্যস্ত করিল।

'না, দেখুন, আপনি যান, আপনি এখন যান।' সঞ্জীব সাতঙ্কে কহিল।

'কি নিষ্ঠুর আপনি! কেন যাব, যাব না।' বলিয়া ইলা অকস্মাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'দেখুন, এ ঠিক হচ্ছে না, এ উচিত হচ্ছে না...' সঞ্জীব প্রায় অনুনয়ের স্বরে কহিল।

ইলা ইহার জবাব দিল না। সঞ্জীবের বিছানাটার উপর অকস্মাৎ আসিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। সারা বালিশময় ছড়াইয়া পড়িল তার খোলা চুল; ড্রেসিং-গাউনের আবরণ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। ঢিলা সেমিজের তলায় বুক দ্রুত উঠা-নামা করিতেছে। রাঙা ঠোঁট দুটি ফাঁক হইয়া যেন একটা তৃপ্ত আয়াস ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে।

সঞ্জীবের দিকে একবার চটুল অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল, 'পেছনের দরজাটার ছিট্‌কিনি বন্ধ করে দিন তো···'

সঞ্জীব পাংশু-মুখে কহিল, 'আপনি যদি না যান, তবে আমাকেই বেরিয়ে যেতে হবে।'

'বটে।' বলিয়া ইলা তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিল। পলকে সে সঞ্জীবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার দুই ক্ষীণ বাহুলতা সঞ্জীবকে দু'দিক হইতে বেষ্টন করিল; মাথাটা কাৎ হইয়া পড়িল সঞ্জীবের বুকের উপর। উত্তেজনায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কহিল, 'আপনার গায়ে কি মাছের রক্ত? আপনি কি রকম পুরুষ মানুষ, একটুও কি ভালবাসা···'

হাত বাড়াইয়া ইলা বিদ্যুৎ-আলোর সুইচটা ঠেলিয়া দিল। ঘর অন্ধকারে পূর্ণ হইল।

একটা ঠেলাঠেলি। চেয়ার সরার ও টিপয় উল্টানোর শব্দ। একটা আর্তনাদ। ইহার পর আন্দাজে সুইচ খুঁজিয়া ইলা যখন আবার ঘরটা আলোকিত করিল, তখন সঞ্জীব আর সে ঘরে নাই।

একটা আহত পশুর মতো চিৎকার করিয়া ইলা বিছানার উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল।

আঠারো

গত পনেরো দিন ধরিয়া দশার্ণপুর টেক্সটাইল মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

ধর্ম্মঘট শুরু হইবার পূর্ব্বে য়ুনিয়নের এক প্রতিনিধিদল ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ কেশবের কাছে মজুরদের দাবির এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ্ করিয়াছিল; তাহাদের উপস্থিতিতেই কেশব তাহা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলে। রুষ্ট এবং রূঢ় ভাষায়ই সে উহাদের জানায় যে, ব্যক্তিগত ভাবে সে বিভিন্ন মজুরের অভাব-অভিযোগ শুনিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ য়ুনিয়নের কোনও কথাই যে শুনিবে না। ভুইফোঁড় য়ুনিয়নকে সে স্বীকার করিতে রাজি নয়।

য়ুনিয়নও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। য়ুনিয়নের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া দলে দলে মজুর বাহির হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মঘট জোর ধরিয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রমিক-নেতারা হাজির হইয়াছেন। প্রত্যহই মিটিং হইতেছে। কারখানার সামনে পিকেটিং চলিয়াছে। নানা রকম ধ্বনি উঠিতেছে; হৈ-হল্লার অন্ত নাই। শ্রমিকদের জামায় বিভিন্ন প্রকারের ব্যাজ্ আঁটা। এত বড় একটা জীবন্ত কারখানা যেন মারাত্মক বীজাণুর আক্রমণে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া ধুঁকিতেছে।

কেশব যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। এখানে ছুটিতেছে, ওখানে ছুটিতেছে। এর কাছে তার পাঠাইতেছে, ওর কাছে বিশ্বস্ত পত্রবাহক মারফৎ চিঠি প্রেরণ করিতেছে। কারখানার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদের বলিতেছে, 'নিজ-হাতে কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হোন্।' কিন্তু ইহাদের পক্ষে গায়ে খাটিয়া কাজ চালু করা যে সম্ভব নয়, তাহাও সে বেশ বোঝে। মজুরদের শাসাইবার

সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে তাহাদের কাছে আনুগত্যের আবেদন জানাইতেছে। নতুন ভাতা ও বোনাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া ধর্ম্মঘট যে কতগুলি বাহিরের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লেবর-লীডারের জঘন্য প্ররোচনার ফল তাহা ঘোষণা করিতেছে, এবং যাহারা কাজে ফিরিবে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভয় দিতেছে। কিন্তু উহাতে কোন ফল হইতেছে না। বরঞ্চ যে সব মজুর তখনও প্রকাশ্যভাবে বিক্ষোভে যোগ দেয় নাই, তাহারাও ধর্ম্মঘট জোর ধরিতে দেখিয়া বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে।

জন-বিরল কারখানার নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয় যন্ত্রগুলির দিকে চাহিয়া কেশব যেন মার-খাওয়ার ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। তার পাঁজ্‌রাগুলি পর্য্যন্ত যেন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। এত বড় অপচয়! এমন অপরাধ-জনক আলস্য! ধর্ম্মঘট চিরদিনের জন্য বে-আইনী করিয়া দেওয়া উচিত! অভিযোগে, ক্রোধে, ক্ষোভে, মজুরদের অকৃতজ্ঞতায় কেশব যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিল: 'আমার মজুরদের কি আমি ভালো হারে মাইনে দিইনি? যোগ্য লোকের যোগ্যতা কি আমি স্বীকার করিনি? আমাদের চেয়ে বেশি বোনাস্‌ আর কোন্‌ মিল্‌ দিয়েচে? অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ এই ছোটলোকগুলি!'

বাড়ি যাওয়া কেশবের পাটে উঠিয়াছে। যেসব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই এবং যেসব নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারি এখনও অনুগত আছে তাহাদের এক মিনিটও একা রাখিয়া আসিতে সে ভরসা পায় না, পাছে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাহারাও গিয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়! কারখানার নির্জ্জনতার মধ্যে সশব্দ পদক্ষেপে কেশব উন্মাদের মতো সর্ব্বত্র অযথা পায়চারি করিয়া বেড়ায়।

তরুণ য়ুনিয়নও তারুণ্যের শক্তি-পরীক্ষায় নামিয়াছে, তাহারাও ধর্ম্মঘট সফল করিতে বদ্ধপরিকর। ধর্ম্মঘট চালাইবার পক্ষে প্রথম বাধা মজুরের পেটের ক্ষিধা। ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও য়ুনিয়ন করিয়াছে। গ্রামের

মজুরদের এখনও ক্ষেত হইতে কিছু ধান আসে, শহরের মজুরের তুলনায় ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। বহু ধর্ম্মঘটী স্বেচ্ছায় ঘরের চাল আনিয়া স্ট্রাইক্-ফণ্ডে জমা করিয়া দিল। ইহা ছাড়া, চাঁদাও উঠিতেছে। আশেপাশের দুপাঁচখানা গ্রাম পর্য্যন্ত চাঁদা-আদায়কারীদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। সজ্‌নেহাটার হাটে যারা জিনিষ বেচিতে আসে তাহাদের উপর পর্য্যন্ত স্ট্রাইকের তোলা ধার্য্য হইয়াছে, এবং আশ্চর্য্য এই যে, ইহাদের অধিকাংশই এই তোলা দিতে সামান্য আপত্তিও করিতেছে না। দশার্ণপুরের রাস্তায় নতুন কাহাকেও দেখিলেই চাঁদা-আদায়কারীরা চাঁদার বাক্স নাড়িতে নাড়িতে কাছে ছুটিয়া আসে।

'ধর্ম্মঘটের সাহায্যে কিছু চাঁদা দিন, স্যার।'

'কিসের চাঁদা!'

'আজ্ঞে মিলে ধর্ম্মঘট চলছে, জানেন না? মালিক চায় মজুরদের পেটে মেরে শায়েস্তা করতে। আমরা চাঁদা তুলচি তাদের খাইয়ে যুদ্ধ করবার জন্য জীইয়ে রাখতে। দু'চার আনা যা হয় দিন, স্যার। গরিব মজুরদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সাহায্য করুন…'

সঞ্জীব একবার চোখ উঠাইয়া চাঁদা-আদায়কারীর মুখের দিকে চাহিল। চিনিতে পারিল না। পকেটে হাত ঢুকাইয়া একটা রূপার টাকা বাহির করিয়া আনিল, এবং নীরবেই চাঁদার বাক্সের ছ্যাঁদার ভিতরে ফেলিয়া দিল।

চাঁদা-আদায়কারী খুসি হইয়া কহিল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

সন্ধ্যার মুখেই সঞ্জীব দশার্ণপুরে পৌঁছিয়াছিল। এখানকার আব-হাওয়ায় একটা উত্তেজনা ও আলোড়ন সে ইতিপূর্ব্বেই যেন আঁচ করিয়াছিল। কিন্তু এসবে মন দিবার মতো তার মানসিক অবস্থা নয়।

নীরবেই সে গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের পরিত্যক্ত বাড়িগুলির দিকে আগাইয়া যায়। প্রায় এক বছর আগে সে এই কেন্দ্র ছাড়িয়া একান্ত চোরের মতোই পালাইয়া গিয়াছিল। আজ পলাতক আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

সঙ্ঘের কাছে আসিয়া সে কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গভীর অন্ধকারে প্রত্যেকটি কুঁড়েঘর, প্রতিটি গাছ, প্রত্যেক ঝোপঝাড় যেন অভিমান করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াও কেহ একটু সাড়া দিল না। সঞ্জীবের নিজেকে যেন অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কে জানে কেষ্টর মা এখনও এখানে আছে কিনা। সঞ্জীব তাহাকে দুইবার মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়াছে ; একবারও তাহা ফিরিয়া যায় নাই। কেষ্টর মার থাকিবারই কথা। এক যদি তার পালানো-ছেলে ঘরে ফিরিয়া থাকে। সঞ্জীব নিজেও বাড়ি-পালানো ছেলে। সে-ও ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু অন্ধকারে তাহাকে দেখিয়া কেষ্টর মা ভয় পাইবে না তো? এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য নিশ্চয়ই সে প্রস্তুত নয়। সঞ্জীব দু'পা আগাইল। দেখিল, যাহা একদিন পথ ছিল, তাহা আগাছা ও কাঁটা-গাছে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। আরও দু এক পা আগাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশেষ অগ্রসব হওয়া গেল না। এই ঝোপজঙ্গল ভাঙিয়া অগ্রসর হওয়া শুধু কঠিন নয়, বিপজ্জনকও বটে। কোথা হইতে একটা সাপ-কোপ বাহির হইয়া পড়ে তাহারই বা আশ্চর্য্য কি। একটা আলো থাকিলে মন্দ হইত না।

অগত্যা সঞ্জীব একটা দিয়াশলাই সংগ্রহের জন্য বাজারের দিকে যাওয়াই স্থির করিল। অন্ধকারে ভূতের মতো একবার সঙ্ঘের সারা চৌহদ্দি প্রদক্ষিণ করিয়া সে কারখানা-অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইল। এদিকটা তার ভালো চেনা নাই। কারখানা প্রতিষ্ঠার পর এদিকে সে

বড়ো একটা আসে নাই। তাহার অজ্ঞাতেই এখানে ছোটখাটো একটা শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

পথে আসিতে আসিতে একাধিক লোকের উত্তেজিত উক্তি হইতে সে একটা বিক্ষোভের আভাস পাইয়াছে। কারখানা-শহরের পক্ষেও এ সময় একসঙ্গে এত লোকের চলাচল একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। এমন সময় চাঁদা আদায়কারীর দৃষ্টিতে পড়ায় সঞ্জীবের পক্ষে ব্যাপারটা জানার সুযোগ হইল।

'ধর্ম্মঘট হলো কেন?' একটু দ্বিধা করিয়া সঞ্জীব প্রশ্ন করিল। 'মাইনে বাড়ানো?'

'তা তো আছেই', চাঁদা আদায়কারী কহিল। 'কিন্তু ঝগ্‌ড়া শুরু হলো ঐ ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জের ব্যবহারে। লোকটা একটা বেহদ্দ পাজি। ওর জুলুমে সারা কারখানার লোক ক্ষেপে উঠেচে। কাজ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। সর্ব্বদা চাবুক উঁচু করে খাড়া। ঊর্দ্ধশ্বাসে খাটিয়ে নেবে। যদি একটু ঢিলে দিয়েচ তো গেচ। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সারাক্ষণ এক কাণ্ড বাঁধাচ্ছে। বড় হও আর ছোট হও, অপমানের হাত থেকে কারুর রেহাই নেই। অসুখ হলে ছুটি পাবে না। ছেলে মরচে, দেখতে যাওয়া চলবে না। তার মর্জ্জি হলো, অমনি বাড়্‌তি শিফ্‌ট্ খাটতে হবে, তা তোমার দেহে কুলোক আর নাই কুলোক। কারখানার কাজ ঝড়ের মতো চলা চাই। মজুর বাঁচুক আর মজুর মরুক, তাতে কি এসে গেল! অথচ বোনাস্ দেবার বেলায় আঁটিশুটি। অন্য পাঁচটা মিলের দৃষ্টান্ত দেখাবে। না, অমুক মিল্ অত দিয়েচে, তমুক মিল তত দিয়েচে। অথচ কাজের চাপ সেখানে কেমন আর এখানে কেমন, তারা কত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেচে, ভালো কোয়ার্টার্স তৈরি করে' দিয়েচে, সে সম্বন্ধে কথাটি নেই। কিন্তু কিছু কি তাকে বোঝাবার উপায় আছে। বলে, কারখানার সাহেব-

ম্যানেজারই পাত্তা পায় না। য়ুনিয়নের প্রতিনিধিরা সব গেল দাবির ফিরিস্তি নিয়ে। তপ্ত তেলে জলের ছিটে! চোখ লাল করে' একেবারে খেঁকিয়ে উঠলে। বল্লে, "ভুঁইফোড় য়ুনিয়ন আমি মানিনে। বেরিয়ে যাও, দূর হও।" দাবির ফিরিস্তি টুক্‌রো টুক্‌রো করে' মেঝেতে ছুঁড়ে মারলে…'

'কে এই ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জ, বলতে পার? কি নাম?' সঞ্জীব ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

'ঐ তো আপনার গিয়ে, কি বলে, ঘোষ-সাহেব,' চাঁদাপ্রার্থী কহিল। 'কি জানি পুরো নামটা! কে, সি, ঘোষ। কেশব ঘোষ। সাহেবের ওপর সাহেব! ম্যানেজিং-ডিরেক্টর মিত্তির-সাহেব বিলেত যাওয়ার পর থেকে ইনি যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করা শুরু করেচেন। ভাবচেন, "আমি যা করব, তাই হবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আমি ভগ্নিপোত্‌ হতে চলেছি, জমিদারবাড়ির জামাই হবো, আমার সঙ্গে কার তুলনা!…সে আর কত বলব। এখন তবে আসি, স্যার। আপনি বুঝি নতুন এসেচেন? যদি সময় পান, ভোরের দিকে বেড়াতে বেড়াতে একবার কারখানার বড় ফটকের দিকে যাবেন। ঘোষ-সাহেব ক্ষেপে উঠে কেমন লাফালাফি করেন, দেখে মজা পাবেন। ভাব দেখে মনে হবে, একাই তিনি রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে টেনে নিয়ে কারখানায় পুরে' ফেলবেন…'

সঞ্জীবের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভারাক্রান্ত মনে সে আগাইয়া চলিল। কারখানা-জীবনের এই সংঘর্ষকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করিয়া আসিয়াছে।

বাজার অঞ্চলের একটা চা-চপের দোকানে জোর ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। সঞ্জীব ইহার নিকটে আগাইয়া আসিল।

দোকানি বেচারি এই ধর্ম্মঘটের ধাক্কায় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গত কয় দিন ধরিয়া তার খদ্দেরের সংখ্যা ক্রমশ কমিতে কমিতে প্রায়

শূন্যেতে আসিয়া ঠেকিবার উপক্রম, অথচ প্রত্যহই দোকান সাজাইয়া, ডে-লাইট জ্বালাইয়া ঠাট বজায় রাখিতে হয়। লোকসানের জন্য সে ধর্ম্মঘটীদের না মালিকদের দায়ি করিবে, ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছেনা। সঞ্জীবকে এদিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া সে খাতির করিয়া কহিল, 'আসুন, আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। গরম চা-চপ তৈরি আছে। এ ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তাও দু'দশ মিনিটের মধ্যে রেডি করে' দেব।··· ওরে বিষ্টুচরণ, বড় পেয়ালায় বেশ ভালো করে' এক কাপ ডবল চা বানা দিকি···'

সঞ্জীব এই সাদর-আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া দোকানে ঢুকিয়া পড়িল এবং অয়েল-ক্লথ মোড়া একটা টেবিলের ধারে ছ্যাংলা-পড়া ভেনেস্তা কাঠের এক বিপজ্জনক চেয়ারে আসন গ্রহণ করিল।

'চপের সঙ্গে একটা ডবল ডিমের মাম্‌লেটও ভেজে দিই, কি বলেন ?' দোকানী 'আর চারটি খাও' ধরণের সুরে আত্মীয়তা দেখাইয়া কহিল।

'আমাকে চারটি ভাত দিতে পার ?' সঞ্জীব কহিল।

চপের রাজ্য হইতে একেবারে ভাতের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য দোকানী প্রস্তুত ছিলনা। কিন্তু সে মোটেই দমিল না। কহিল, 'পারি বৈকি, নিশ্চয়ই পারি। নিকুঞ্জ মাইতি সব্ব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকে, স্যার। তবে আধঘণ্টাটেক দেরি করতে হবে, এই যা। মটন-কারি আর রাইস, কি বলেন ? তা দামও তেমন পড়বে না দেড়টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। যা মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজার, দেখচেন তো !···ওরে বিষ্টুচরণ, বাবুকে চা দিয়েই চট্ করে চারটি সরু চাল চড়িয়ে দে, বুঝলি।'

এক ঘণ্টা গত হইবার পরও খাদ্য প্রস্তুত হইল না বটে, কিন্তু নিকুঞ্জ মাইতি মহাশয়ের কাছ হইতে সঞ্জীব ধর্ম্মঘটকারী ও মালিক উভয় পক্ষের

পক্ষপাতহীন সমালোচনা শুনিতে পাইল। ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সে ওয়াকিব্‌হাল হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ বলিতে লাগিল, 'আর এই হারামজাদাদের দোষই কি কিছু কম, স্যার। আমিও তো পাঁচটা জায়গায় রেষ্টুরেণ্ট চালিয়ে এসেচি, এর চেয়ে ভালো মজুরি কোথায় দেয় শুনি? আর মনিব, মনিব। রেগে যদি দুটো কড়া কথা বলেই, একটু শাসায় বা ধমকায়, তাই বলেই হুট করে' ধর্ম্মঘট ডেকে বেকার সাজতে হবে? দেখুন তো একবার কাণ্ড! এই যে এত খরচা করে' দোকান সাজিয়ে বসেচি, বিক্রি না-হলে কোত্থেকে তার খরচা উঠবে শুনি? সন্ধ্যেয় যেখেনে দোকানে জায়গা দিতে পারতুম না, ডজন ডজন খদ্দের ফিরিয়ে দিতে হ'তো, সেখেনে কি হাল হয়েছে, একবার দেখুন। সারা দিনে একটাকার বিক্রি নেই। ভেবে দেখুন তো কাণ্ড-খানা। ব্যাপার কি, না হাতে টাকা নেই, চা খাবার পয়সা কোথায় পাই! কিন্তু যান্, দেখুন গিয়ে তাড়ির দোকানে, মেয়েমানুষের বস্তির ধারে, এতক্ষণে ইয়া লম্বা 'কিউ' দাঁড়িয়ে গেছে…'

সঞ্জীব একবার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকাইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

'আজ্ঞে, স্যার, মোটেই বাড়িয়ে বলছি না।' ধূর্ত্ত দোকানী সহজেই সঞ্জীবের দৃষ্টির তাৎপর্য্য বুঝিয়া কহিল। 'বিশ্বেস না হয়, একটু এগিয়ে গিয়ে নিজ চক্ষে দেখে আসুন। আমার ব্যবসায় মন্দা এলে কি হবে, ও দু'টি ব্যবসা ফেঁপে উঠেচে। ব্যাটারা সব মরিয়া হয়ে উঠেচে কিনা, দুঃখ ভুলতে চলেচে। এর ফলও টের পাবি, ব্যাটারা। কুব্যাধি হয়ে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত জ্বলে মরবি…'

সঞ্জীব স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কারখানা-জীবনের ব্যাধিগুলি সকলই তবে চরম হইয়া দশার্ণপুর গ্রামে দেখা দিয়াছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে এতটা নৈতিক অবনতিও সম্ভব!

'তবে এ-ও বলি, স্যার,' নিকুঞ্জ সহসা সহানুভূতির সঙ্গে কহিল, 'মেয়েমানুষের বাড়ির সামনে 'কিউ' করে বলে যতই নিন্দে করিনে কেন, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? ভিন্-গাঁয়ের হাজার লোক মজুরি খাটতে এসেচে। ফ্যামিলি রাখবার সুব্যবস্থা নেই, সবই বে-আব্রু কাণ্ড। আর মাইনে-মজুরিও এমন নয় যে একমাত্র তা দিয়েই পরিবার পোষণ করা যায়। অনেকেই স্ত্রী-পরিবার বাড়িতে রেখে আসে, না রেখে এসে উপায় নেই। কাজেই বুঝতেই পারচেন, এ না হয়ে আর উপায় কি। দেহের ক্ষুধা যেমন-তেমন করেই মেটাতে হয়। বলুন তো, এ কি মান্‌ষের জীবন ! জানোয়ারের সঙ্গে মান্‌ষের তফাৎ কোথায় !···ওরে ও বিষ্টুচরণ, করচিস কি শুনি ? বলি, ধানক্ষেত থেকে ধান তুলে চাল ভানতে গেচিস নাকি ? ইদিকে যে বাবুর দু'চোকে ঘুম ঠেলে আসচে।·· হয়ে যাবে, স্যার, এক্ষুনি খাওয়ার তৈরি হয়ে যাবে·· '

'এখানে আজ রাতের মতো শোবার বন্দোবস্ত হ'তে পারে কি ?' সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল। এই অন্ধকারে আজ আর সঙ্ঘে প্রবেশ করিবে না বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সে স্থির করিযাছে।

'এইখেনেই শোবেন !' নিকুঞ্জ মাইতি পুলকিত হইয়া কহিল। 'আজ্ঞে, হ্যাঁ। তারও ব্যবস্থা আমার আচে। কোনওটায়ই ঠকাতে পারবেন না ! আপনার মতো ভদ্রলোককে এক রাত ঘরে জায়গা দিয়ে যদি একটা পুরো টাকা হাতে আসে, এই দুর্দ্দিনে তাই বা কম কি ? আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে' দিচ্চি।' বলিয়া নিকুঞ্জ মাইতি তাড়াতাড়ি পিছনের কামরায় প্রস্থান করিল।

উনিশ

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় গুজব রটিয়াছিল, মিল-কর্ত্তৃপক্ষ একদল শ্রমিক ভাগাইতে চেষ্টা করিতেছে এবং এই শ্রমিকেরাও অধিক পারিশ্রমিক ও ভবিষ্যৎ খাতিরের আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্য যেখানে এত বেশি, প্রলোভন সেখানে কাজ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি।

পর দিন প্রভাতে কারখানার সিটি বাজিবামাত্র দলে দলে ধর্ম্মঘটীরা সেদিকে ছুটিল। রোজই যায়, পাহারা দেয়, উদ্বিগ্ন ও ক্লিষ্ট মজুরদের দল ভাঙিয়া কাজে না-ভিড়িবার পরামর্শ দেয়, একতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করে, এবং প্রয়োজন হইলে টানাটানি এবং জোর-জুলুম বা ভীতি-প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হয় না। অল্প কয়েক জনের দুর্ব্বলতায় বা লোলুপতায় এত অসংখ্য ধর্ম্মঘটীর পরাজয় ঘটিতে দেওয়া চলে না।

কারখানার প্রধান ফটকে মিলের বড় বড় কর্ম্মচারিদের সঙ্গে লইয়া কেশব দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, যেন সে একাই সমস্ত ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে লড়াই করিতে প্রস্তুত আছে। খাকি ফুল-প্যাণ্টের উপর সাদা বুশ-শার্ট পরণে। কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধে রিভলবারটা খাপে ঢাকা আছে। অন্তত দুই ডজন গুর্খা এবং ভোজপুরী দারোয়ান কারখানার প্রধান ফটক আগ্‌লাইয়া আছে।

ইতিমধ্যে ধর্ম্মঘটীদের জনতা কারখানার প্রবেশমুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ কোনও কৌশলে শ্রমিক ঢুকাইতে চেষ্টা করিলে

ইহারা এক যোগে তাহাতে বাধা দিবে। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের সঙ্গে যেন সম্মুখ-সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কেশবের চোখে আহত কোন্‌-ঠাসা বাঘের চাহনি। নিজের পুঞ্জীভূত দুর্দ্ধর্ষ শক্তির প্রাবল্য সত্ত্বেও শিকারীর ফাঁদে পড়িলে ব্যাঘ্রের যে অবস্থা হয়, তাহারও প্রায় সেই অবিশ্বাস্য অবস্থা। এত শক্তি, এত ক্ষমতা সত্ত্বেও যেন তাহার প্রয়োগের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। দুর্জ্জয় ক্রোধে নিজের হাত-পা কামড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। তবু পরাজয় স্বীকার করা তাহার স্বভাব নয়, যুদ্ধ করিতে সে ভয় পায় না। সমবেত ধর্ম্মঘটীদের দিকে চাহিয়া সে সগর্জ্জনে হাঁকিয়া কহিল, 'যে কাজে আসতে চায়, তাকে কারুরই জোর করে আটকাবার অধিকার নেই। কোনও জুলুমই চলবে না। কোনও জবরদস্তি আমি সহ্য করব না, জোরের জবাবে জোর খাটান হবে। যে চাও চ'লে এস। কিছু ভয় নেই। আমি তাদের রক্ষা করব। এই দেখ আমার দারোয়ানরা তৈরি আছে। আর একটু দূরেই ঘাঁটি বেঁধেচে পুলিশ। যারা কাজে যোগ দিতে চায় তাদের যারা বাধা দেবে, তাদের গুলি করবার হুকুম পুলিশের আছে…'

জনতার পিছন হইতে জবাব আসিল, 'নিপাত যাক্ তোমার দারোয়ান আর তোমার পুলিশ! ভাইসব, নড়ো না, দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। ছেঁদো কথায় কান দিয়ো না, লোভে পড়ে' ভুলো না। য়ুনিয়নের জয় হোক, ধর্ম্মঘটের জয় হোক। মালিকের জুলুম দূর করা চাই…'

এই হুঙ্কারের চ্যালেঞ্জ্‌ গ্রহণ করিয়াই যেন কেশব মজুরদের কাছে দু' পা আগাইয়া আসিল। সামনে পরিচিত কয়েকজন শ্রমিককে দেখিতে পাইয়া যেন আত্মীয়ের কাছে দাবি জানাইতেছে এমন করিয়া ডাকিয়া কহিল, 'এস চতুর্ভুজ, তুমি এস। এস ভবানী। এক বৎসরে তুমি দুটো প্রমোশন পেয়েচ, তোমার নিশ্চয়ই কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না।

এই যে গোবিন্দ, তুমিও এস। সব সময়েই যোগ্যতার আমি মূল্য দিয়েচি, মেহনতের পারিশ্রমিক দিতে কখনও কার্পণ্য করিনি। তোমরা যারা আমার হাতে সুবিচার পেয়েচ, তারাও কি কারখানার সঙ্গে শত্রুতা করবে? কতগুলি অবুঝ বোকা লোকের সঙ্গে বোকামি করবে? কতগুলি বাইরের দুষ্ট লোকের উস্কানিতে মেতে উঠবে? যোগ্যতার এবং পরিশ্রমের উচিত পুরস্কার না চেয়েও তোমরা পেয়েচ। এস, অন্ততে তোমরা এস। যাদের কাজ ফাঁকি দিতেই আনন্দ, তাদের আমি চাইনে, আমার কারখানায় তাদের জায়গা নেই। কিন্তু তোমরা এস, তোমরা কাজে এসে লাগ···' বলিয়া দুই হাতে দুইজন দ্বিধান্বিত ভীত শ্রমিককে ধরিয়া কেশব আকর্ষণ করিল। যেন নিজে টানিয়া ইহাদের ধর্ম্মঘটীদের মধ্য হইতে লইয়া আসিবে। কিন্তু কেশব টানা মাত্র অপরপক্ষ হইতেও পাল্টা টান পড়িল। টানাটানি শুরু হইয়া গেল।

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওদের। নইলে আমি গুলি করব, কুত্তার মতো গুলি করে' মারব,' ক্ষিপ্ত কেশব কোমরবন্ধে হাত দিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলচি···'

সহসা ভিড়ের ঠিক পিছন হইতে একটা স্পষ্ট নির্ভীক ভদ্র কণ্ঠে শোনা গেল: 'অন্যে জোর করবে না, এই যদি আপনি চান, তবে আপনার নিজেরও জোর করা চলবে না। আপনিই বা মজুরদের টেনে ভেতরে নিতে চাইবেন কোন্ অধিকারে?···'

এই গলার আওয়াজে শুধু কেশব নয়, কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারী মজুরও চকিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিল। চাপা বিস্ময়োক্তির মতো গ্রামের মজুরদের এক মুখ হইতে অন্য মুখে 'দা'ঠাকুর, দা'ঠাকুর, ওরে দা'ঠাকুর অ্যায়েচেন' বলিয়া একটা চাপা গুঞ্জন পড়িয়া গেল। যে শুনিল সেই ঘাড় ফিরাইয়া এই কণ্ঠের অধিকারীকে দেখিতে চেষ্টা করিল। একাধিক মজুর 'দা'ঠাকুর, দা' ঠাকুর' বলিয়া তাহার দিকে ছুটিল।

কেশব পর্য্যন্ত দুই সেকেণ্ড কাল হাঁ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অবিলম্বেই সে নিজের উপর দখল ফিরিয়া পাইল। তিক্ত কণ্ঠে কহিল, 'ওঃ, সঞ্জীববাবু! গ্রাম ছেড়ে তবে একেবারে পলায়ন করেন নি! পেছন থেকে তার টেনে চলেচেন...'

সঞ্জীব দু'পা কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'দোহাই কেশববাবু, এটা ঝগড়ার সময় নয়। কারখানার সঙ্গে যে ঘৃণা এবং ঈর্ষ্যা জন্মলাভ করবে বলে' আমি একদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তা সত্য হয়ে উঠেচে। কিন্তু একে আর বাড়াবেন না। ফেনিয়ে তুললে একে আরও বড়ো করা হয়। দু'দলকেই ঠাণ্ডা হবার অবকাশ দিন, জেদাজেদিতে ক্ষতি আরও বেড়ে ওঠে...'

'মোদ্দা কথা এই,' কেশব না নরম হইয়াই কহিল, 'আপনি এদের ভেতরে আসতে দেবেন না, কেমন?'

'আমি ওদের বাইরে আসতেও বলিনি,' সঞ্জীব শান্ত কণ্ঠেই কহিল, 'ভেতরে যেতে বলবার অধিকারও আমার নেই। আমি শুধু...'

'অবশ্য বলেচেন,' কেশব গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'আলবৎ ওদের আপনি উস্কানি দিয়েচেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম মাথা কাজ করচে, এ সন্দেহ আমি আগেই করেছিলাম। আপনার মতো মান্ধাতা-পন্থী ছাড়া কেউ একটা কারখানা বন্ধ হয়ে থাকলে আনন্দ বোধ করে না। এই কারখানার প্রতি আপনার শত্রুতার কথা আমি ভালো করেই জানি। আপনার উদ্ভট আইডিয়ার সঙ্গে খাপ খায়নি বলে এর শুরু থেকে আপনি কি রকম বিরুদ্ধাচরণ করেচেন, তা সবই স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তখনও যা পারেন নি, এখনও তা পারবেন না। আপনি চান আর না চান, এই কারখানা চলবে...আমার কারখানার মুখ যাতে কেউ আগ্‌লে রাখতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে আমি পিছ-পা

হবো না...' বলিয়া অপেক্ষমান লাঠিধারী দারোয়ানদের দিকে চাহিয়া সে আদেশ দিল, 'যাও, হটাও, সব কোই কো হটাও...চালাও লাঠি, লাঠি চালাও...কোই ঘায়েল হোনেসে হম জিম্মাদার হোঙ্গে...'

প্রহরীরা এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিল। তারপর সহসা 'ভাগো ভাগো' গর্জ্জন করিতে করিতে মাথার উপর লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জনতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জনতার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল আলোড়ন শুরু হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে, হুঙ্কারে, ছুটাছুটিতে, আর্ত্তনাদে, গালাগালিতে আকাশ ভরিয়া গেল।

এই কোলাহলের মধ্যে প্রাণপণে চিৎকার করিয়া সঞ্জীব বলিতে লাগিল, 'থামতে বলুন, এদের থামতে বলুন, এদের থামান, কেশববাবু। নইলে পরিণামে আপনাকেই অনুতাপ করতে হবে। রাগের মাথায় অনর্থ সৃষ্টি করবেন না। আপনার কাছে আমি অনুরোধ করচি, হাত জোড় করে অনুরোধ করচি, এমন সর্ব্বনাশ বন্ধ করুন। এমন বড় ভুল করে' আপনি নিজের এবং এদের ক্ষতি করবেন না, করবেন না, কেশববাবু...' বলিয়া সঞ্জীব এই ভিড় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রাণপণে কেশবের কাছে আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা মিলের ক্ষিপ্ত দারোয়ানদের একটা লাঠির বাড়ি তাহার হাতের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মাথায় আসিয়া পড়িল। এক সেকেণ্ড একবার লাটিমের মতো ঘুরিয়া, শূন্যে অসহায় হাত ছুঁড়িয়া সঞ্জীব পলায়নপর জনতার মধ্যে ঢলিয়া পড়িল।

'মেরে ফেলেচে, মেরে ফেলেচে, দা'ঠাকুরকে মেরে ফেলেচে,' বলিয়া একটা শঙ্কিত কোলাহল উঠিল।

•

'সরে যাও, সরে যাও, সামনে থেকে সরে যাও।' নারীকণ্ঠের একটা ভীত অসহিষ্ণু চিৎকারে জনতা সহসা ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই জমিদার-কন্যা ভিড়ের মধ্য দিয়া পাগলিনীর মতো দৌড়াইয়া সমুখ দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

'সরুন, সরুন, পথ দিন,' জনতা চেঁচাইয়া উহার পথ মুক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

দুই মিনিট পূর্ব্বে ভিড়ের পিছনে যখন প্রতিমার গাড়ি সবেমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গেছে। জনতার এই আলোড়নের কারণ না বুঝিয়াই সে আগাইয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ চোখ পড়িল গেটের দিকে। দেখিল, সঞ্জীব কি বলিতে বলিতে দুই হাত শান্ত হওয়ার আবেদনের ভঙ্গিতে সামনে উঠাইয়া আগাইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিস্ময়টা হজম করিবার সময়ও প্রতিমা পাইল না। নিজের চোখেই দেখিল, গেটের দারোয়ানদের একজনের প্রকাণ্ড একটা লাঠি সজোরে আসিয়া সঞ্জীবের মাথার উপরে পড়িল। প্রতিমা চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কেহ তাহা শুনিল না। ভিড়ের মধ্যে সঞ্জীব গড়াইয়া চাপা পড়িয়া গেল।

'সরে যাও, সরে যাও,' বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে প্রতিমা কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বম্ভর, পতিতপাবন, গঙ্গারাম এবং য়ুনিয়নের বহু লোক ইতিমধ্যে কাছে আগাইয়া আসিয়াছিল; প্রতিমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জায়গা ছাড়িয়া দিল। সঞ্জীব সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া আছে, মাথা দিয়া রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছে। পলকে কাছে বসিয়া এই রক্তাক্ত মাথাটা প্রতিমা নিজের কোলে উঠাইয়া শাড়ির অঞ্চল দিয়া রক্ত চাপিয়া ধরিল। অন্য দিকে না চাহিয়াই সে চেঁচাইতে লাগিল, 'জল! জল! ডাক্তার ডাক...'

ইতিমধ্যে কেশবও ছুটিয়া আসিয়াছে। এত বড় অনর্থের জন্য সে-ও প্রস্তুত ছিল না। জনতা তাড়াইবার জন্য রাগের মাথায়ই সে আক্রমণের আদেশ দিয়াছিল। কাছে আসিয়া সে কহিল, 'তুমি সর প্রতিমা, তুমি

ভেতরে যাও। আমরা এর ভার নিচ্চি···ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হয়েচে, তিনি আসচেন। তুমি ভেতরে যাও···'

'থামুন! কোনও উপদেশের প্রয়োজন নেই,' কেবল একবার কেশবের দিকে অশ্রু-আপ্লুত চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া প্রতিমা চোখ ফিরাইয়া লইল। 'কারুর হুকুম মতো চলার অভ্যাস আমার হয়নি; অন্তত এমন লোক যদি আমার কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করতে আসে যার আচরণে আমি নিজে লজ্জায় মরে যাচ্চি, তার কথা মানবার চেয়ে আমার মরা ভালো। যান্, নিজের কাজে যান,' বলিয়া সদ্য-আনিত জলের মগ্-এ আঁচল ভিজাইয়া লইয়া সে পাশের একজনকে কহিল, 'কে ডাক্তার ডাকতে গেছে? তুমি একবার যাও, ছুটে যাও···'

শীঘ্রই মিলের ডাক্তারবাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর মজুরদের ক'জন ধরাধরি করিয়া অচেতন সঞ্জীবকে প্রতিমার মোটরে লইয়া আসিল। উদ্বিগ্ন বিবর্ণমুখে প্রতিমার পিছনে চলিতে চলিতে মিলের বুড়া ডাক্তারবাবু জিহ্বাতে আক্ষেপসূচক শব্দ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সাঙ্ঘাতিক লেগেছে, বড় সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! এবার জ্ঞান ফিরলে বাঁচি···'

কুড়ি

সন্ধ্যার পর কর্ণেল মুখার্জ্জি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিলেন এবং সঞ্জীবের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন,আঘাত গুরুতর হইলেও আশঙ্কার আর কারণ নাই, তবে দুই তিন দিন খুব হুঁসিয়ার হইয়া থাকিতে হইবে। মিলের বড়ো এবং ছোট ডাক্তারবাবুকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তিনি শীঘ্রই আবার কলিকাতায় রওনা হইয়া গেলেন। প্রতিমা তাহাকে থাকিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিল, কিন্তু কর্ণেল মুখার্জ্জি জানাইলেন, তাহা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ, কাল ভোরে তাহার একটা জরুরি মেজর অপারেশন রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেও তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নহে।

কলিকাতার বিখ্যাত সার্জ্জেন কর্ণেল মুখার্জ্জির মত শুনিয়া প্রতিমা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু রাতটা তিনি অপেক্ষা করিতে রাজি না হওয়ায় তার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল না। কে জানে, অবিলম্বে প্রস্থান করিবার অবকাশ সৃষ্টির জন্যই তিনি অভয় দিয়াছেন কিনা। কিন্তু উপায়ান্তর ছিলনা। মিলের দুই ডাক্তারকেই রাতে এই বাড়িতে শুইবার নির্দ্দেশ দিয়া সে বিপদের প্রথম রাত কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রতিমার সকল অভিমান চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এত বড়ো সর্ব্বনাশের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। মিলে যাইবার মুখে আজ ভোরেও একবার সে সঞ্জীবের পরিত্যক্ত আশ্রমে কুকুরের মতো বিশ্বস্ত কেষ্টর মার কাছে সঞ্জীবের খবর জানিতে গিয়াছিল,এবং প্রথামত কেষ্টর মার একগাদা আক্ষেপ ও হা-হুতাশ মাত্র শুনিয়া অসিয়াছে। হয়তো সেখানে দেরি না করিলে প্রতিমা এমন বিপদ ঘটিবার আগেই মিল্‌-এ যাইয়া পৌছিতে

পারিত। কিন্তু তখন কে জানিত, যাহার ব্যর্থ সন্ধানে সে এমন করিয়া দিনের পর দিন গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘের জঙ্গলাকীর্ণ জন-পরিত্যক্ত চৌহদ্দির মধ্যে ব্যর্থ খুঁজিয়া মরিয়াছে, সেই লোকটি অতি আশ্চর্য্য উপায়ে তাহাদের মিলের সমুখে বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সমুখে দাঁড়াইয়া মিলের দারোয়ান-দের লাঠি মাথা পাতিয়া লইবার জন্য দণ্ডায়মান! কে জানিত, তাহার স্পষ্ট উপদেশ সত্ত্বেও কেশব মজুরদের বিরুদ্ধে এমন অবিমৃষ্যকারী আচরণ করিবে!

খাটের উপর সঞ্জীব ঘুমাইয়া আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; গলা পর্য্যন্ত পাত্‌লা কম্বলে ঢাকা। একবার মাত্র সে চোখ মেলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কি বলিয়াছিল, তারপর আবার চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ইহার খাটের কাছে মাথার ধারে চেয়ার টানিয়া প্রতিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া আছে। ঘড়ি মিলাইয়া ওষুধ দিতেছে, ঘড়ি মিলাইয়া পথ্য আনিতেছে। ব্রজময়ী কলিকাতা হইতে কর্ণেল মুখার্জ্জির সঙ্গে মেম নার্স আনিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া প্রতিমা তাহাতে রাজি হয় নাই। সে বলিয়াছিল,'মিছিমিছি নার্স কেন মা। কলেজে ফার্স্ট্‌ এইড্‌ ক্লাসে যা শিখেছিলাম, সব আমার মনে আছে। আমি নিজেই পারব।' সকল পরিচর্য্যার ভার সে একাই লইতে চায়। যেন অক্লান্ত অতন্দ্র সেবা করিয়া সে নিজের কর্ত্তব্যের ত্রুটি-জনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়। নিঃশব্দে সে সঞ্জীবের আধ-ঢাকা মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সামান্যতম যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিতেছে। একাধিকবার সে উঠিয়া কম্বলের ভাঁজ ঠিক করিয়া দিল, পা পর্য্যন্ত ঢাক্‌না টানিবার সময় পায়ের তলার উত্তাপ লক্ষ্য করিল; ঘুমন্ত সঞ্জীবের কপালে এবং গালে যেন মায়ের মতো স্নেহে হাত বুলাইয়া লইল। থার্মোমিটারে উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া চার্টে লিপিবদ্ধ করিল। যেন এক সেকেণ্ডও অন্যমনস্ক হইতে না হয়, যেন পরি-চর্য্যার সামান্যতম ত্রুটি পর্য্যন্ত না ঘটিতে পারে, এমন নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠা চাই।

রাত ন'টা কি সাড়ে ন'টা হইবে। প্রতিমা গরম জলের ব্যাগ্‌টা রোগীর বুকের পাশে ঠেলিয়া দিয়া আবার নিজের চেয়ারে জায়গা লইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় ঘরের দরজা খুলিবার সামান্য শব্দ শুনিয়া সে ব্যাঘাত আশঙ্কায় সভয়ে তাড়াতাড়ি সেদিকে ফিরিয়া দেখিল, ব্রজময়ী প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতিমা চেয়ারে না বসিয়া অবিলম্বেই পা টিপিয়া মায়ের দিকে আগাইয়া গেল। রোগীর খুব কাছে কথাবার্ত্তা হইলে আবার জাগিয়া উঠিবে কিনা কে জানে। কোনও রকম গণ্ডগোল করা বা এদিকে অনাবশ্যক হাঁটাহাঁটি করিতে বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাদের নিষেধ করা হইয়াছে। কর্ণেল মুখার্জ্জি বলিয়া গেছেন, 'রোগীর পরিপূর্ণ বিশ্রাম চাই।' কোনও রকম ব্যাঘাতই যাতে এই বিশ্রাম ক্ষুণ্ণ না করে, সে বিষয়ে প্রতিমার সাবধানতার অন্ত নাই।

ব্রজময়ী উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, 'এখন কেমন আছে রে?'

'একটু ভালোই আছেন বোধহয়', প্রতিমা ফিস্‌ফিস্ করিয়া যেন মাকে কণ্ঠস্বর আরও নিচু করিবার ইঙ্গিত হিসাবে কহিল। 'কতক্ষণ ধরে' মুখে ব্যথার সেই খিঁচুনিটা নেই।'

'তবে যা, এইবার তুই খেয়ে নে গে। সারা দিনে তো প্রায় কিছুই পেটে পড়েনি···এসব যে কি হচ্চে, কিছুই বুঝতে পারচিনে। এ রকম হৈ-হাঙ্গামায় আমার বড়ো ভয়। মজুররা দলে তো কম ভারি নয়, কি নতুন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসে কে জানে। ইদিকে কেশব এখনও বাড়ি ফেরে নি। ভয়ে আমি সারা হচ্চি। কি যে হবে, কে জানে! কি যে আমি করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে···'

'তুমি এবার শুয়ে পড়ো গিয়ে, মা', প্রতিমা সংক্ষেপে জবাব দিল।

'তার ওপর মহিমও বাড়ি নেই,' ব্রজময়ীর উদ্বেগ বাড়িয়াই চলিল, 'সে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম। সে সব দিক মানিয়ে

চলতে পারে। এ কি মেয়েমানুষের কাজ!...আমার শেষ-কাজটা এখন ভালোয় ভালোয় মিটে যায়, তবে বাঁচি।...অথচ কি সব হাঙ্গামা মারামারি এসে জুটল। কেশবের জন্য ভেবে সারা হচ্চি। দুবার তাকে ডাকতে লোক পাঠালাম, দু'বারই লোক ফিরে এলো...দেখতো, এসব সাম্‌লানো কি মেয়েমানুষের কাজ। মহিম এসে পড়ত, তো আমি বাঁচতাম...'

'দাদা ক'দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।...এবার তুমি শুতে যাও, মা।' প্রতিমা গম্ভীর ভাবে কহিল।

'কিন্তু তুই তো এখনও খাসনি, প্রতিমা। আয়, তোকে খাইয়ে তবে আমি শুতে যাই।...ডাক্তারবাবুরা না হয় কেউ এসে এখানে বসুন...'

'তুমি যাও', প্রতিমা কহিল। 'আমি সময়মত খেয়ে নেব। ডাক্তারবাবুদের খেতে দেওয়া হয়েচে কিনা তুমি বরঞ্চ একবার খোঁজ নিয়ে যাও', বলিয়া প্রতিমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া রোগীর কাছে ফিরিয়া আসিল। অগত্যা উদ্বিগ্নমুখে ব্রজময়ী প্রস্থান করিলেন। সব কিছুই যেন গোলমাল হইয়া গেছে। আশঙ্কায় উদ্বেগে বৃদ্ধা তটস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবী-জামাতার প্রতি কন্যার ঔদাসীন্যেও তিনি ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার মানসিক স্বস্তির পক্ষে সমস্ত ঘটনাবলীই যেন অত্যন্ত বেখাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে।

রাত গভীর হইল। বিছানায় সঞ্জীব নির্জ্জীবের মতো পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিমার চোখের সকল নিদ্রা দূর হইয়াছে। যেন প্রহরীর মতো সতর্কতায় প্রতিমা সকল বিপদের বিরুদ্ধে সজাগ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশটা একটা কালো যবনিকার মতো মেলা ছিল, সহসা তাহা যেন রাঙা হইয়া উঠিল। ক্রমে এই বর্ণ আরও উজ্জ্বল, আরও দীপ্ত হইল। প্রতিমা প্রথমে ইহাকে

প্রভাতের সূচনা বলিয়া মনে করিয়া এত শীঘ্র নিশাবসান হইল বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিল ; হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া তাহার সে ধারণা দূর হইল। উষার আলো হইতে বহুগুণ দীপ্ত আলো আকাশটাকে গাঢ় রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ; দূর হইতে যেন বহু মানুষের আর্ত্তস্বর অতি ক্ষীণ হইয়া একটা অখণ্ড গুঞ্জনের মতো আসিয়া এই অতি-নিঃশব্দ কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রতিমা অবাক্‌ হইয়া গেল। একবার রোগীর দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পূর্ব্বের মতোই শান্তিপূর্ণ এবং নিদ্রিত দেখিয়া প্রতিমা ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সে মুক্ত জানালার দিকে সবিস্ময়ে আগাইয়া গেল।

আগুন। আগুন! কারখানায় আগুন লাগিয়াছে। আকাশে সাপের মতো অসংখ্য শিখা ফুলিয়া ফুঁসিয়া উঠিয়াছে ; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আতসবাজীর মতো ছুটিয়া বাহির হইতেছে। আকাশ গাঢ লাল ; যেন কারখানা-দানবের তেজী লাল রক্ত ফিনিক্‌ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। যেন অরণ্যে অরণ্যে দাবানল লাফাইয়া বেড়াইতেছে ।

করুণ-চোখে এই অগ্নিলীলার দিকে চাহিয়া প্রতিমা কতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া রহিল। কারখানার পশ্চিম অংশে আগুন লাগিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ইহার অধিকাংশ বাঁচান যায় ; সম্ভবত তাহার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই চেষ্টায় যোগ দিবার কোনও উৎসাহ, কোনও আগ্রহই প্রতিমা নিজের মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তবু একটা মস্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া আসিল।

নিঃশব্দে সে আসিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিল।

'কে! প্রতিমা! প্রতিমা?'

চম্‌কাইয়া প্রতিমা বিছানার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। সজীব দুই রাঙা চোখ মেলিয়া আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

প্রতিমা এক মিনিটে উল্লাস ও কান্নার মিলিত উচ্ছ্বাসে তটস্থ হইল। কহিল, 'হ্যাঁ, আমি প্রতিমা।'

'কি হয়েছে, প্রতিমা ?'

'না, কিছু হয়নি। আপনি ঘুমোতে চেষ্টা করুন।'

'আমি কোথায় ?'

'আপনি আমাব কাছে।'

সঞ্জীব আব কোনও প্রশ্ন কবিল না। চোখ বুজিয়া আবাব ঘুমাইয়া পড়িল। প্রতিমাব যেন কান্না পাইতে লাগিল। সঞ্জীবকে এ পয্যন্ত সে যত আঘাত কবিয়াছে, তার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস মনেব মধ্যে ভিড কবিয়া আসিয়া প্রতিমাকে সবলে ঝাঁকুনি দিতে লাগিল।

খুট, খুট্, খুট্। ইতিপূর্ব্বেই কযেকবাব দবজায আঘাতেব শব্দ হইযাছে, প্রতিমা ইহাকে উপেক্ষা কবিয়াছিল। কিন্তু এবাব আব অস্বীকাব কবিবাব উপায নাই। বিবক্তভাবেই প্রতিমা দবজা খুলিয়া বাহিবে আসিল। দেখিল, বামু বেয়াবা অতি উত্তেজিত ভাবে দাঁডাইয়া আছে। ভিতবে ঢুকিবার সাহস সংগ্রহ কবিতে না পাবিযা সে বেচাবি অধৈর্য্যভাবে দবজায টোকা মাবিযা চলিয়াছিল, প্রতিমাকে দেখিয়া সে দ্রুত কহিল, 'দিদিমণি, কাবখানা থেকে দাবোযান এসেছে। বলচে, ধর্ম্মঘটী মজুবেবা কাবখানাব একদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে। নেবাবাব চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সারা কাবখানাই পুড়ে যেতে পাবে'

'পুড়ুক,' প্রতিমা গম্ভীব স্ববে কহিল, 'কিন্তু কোনও বকম গণ্ডগোল কবা চলবে না। এদিকে অনাবশ্যক আসা-যাওয়া করতে আমি মানা করেছিলাম, মনে নেই ?'

'মনে ছিল, দিদিমণি। কিন্তু আমি ভাবলাম…'

'নিজের কাজে যাও।' বলিয়া ভ্যাবাচাকা-খাওযা রামুকে আর ব্যাখ্যাব অবকাশ না দিয়া প্রতিমা ঘরের ভিতরে পুনঃপ্রবেশ করিল।

একুশ

ইহার পর দিন আটেক কাটিয়া গেছে। সঞ্জীবের ব্যাণ্ডেজ এখনও খোলা হয় নাই, কিন্তু সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ণেল মুখার্জ্জি ইহার মধ্যে আরেক দিন আসিয়া উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সঞ্জীবকে গত দুইদিন হইল বিকালে বিছানার পাশে ঈজিচেয়ারে উঠিয়া বসিতে দেওয়া হইতেছে।

আজও বিকালে ঈজিচেয়ারে বসিয়া সে সমুখের খোলা বড়ো জানালাটা দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। দু একটা গাছের শীর্ষ যেন মুখ বাড়াইয়া উঁকি দিয়া সে কতটা সুস্থ হইয়া উঠিল, তাহারই খোঁজ করিতেছে। যেন একটা নতুন জীবন-লাভের মতো মনে হইতেছে সঞ্জীবের। পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরতম দ্রব্যও তাহার ক্ষুধার্ত্ত মুগ্ধ চোখের কাছে মহামূল্যবান বলিয়া মনে হইতেছে। শারীরিক নড়াচড়া বন্ধ হওয়ায় মনটা যেন অত্যধিক সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় তার কল্পনায় বাধা পড়িল। অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর অতি কাছাকাছি শোনা যাওয়া মাত্র তাহার দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি দূর হইতে কাছে ফিরিয়া আসিল। সস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কহিল, 'আবার কি হুকুম, প্রতিমা ?'

'বেদানার রসটা কোনই প্রশ্ন না করে খেয়ে ফেলতে হবে, এই হুকুম।' বলিয়া প্রতিমা বেদানার রস-ভরা কাচের গেলাস কাছে আগাইয়া দিল।

'বেশ, দাও।' বলিয়া নিতান্ত ভালোছেলের মতো সঞ্জীব তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া শূন্য গেলাস প্রতিমার হাতে ফিরাইয়া দিল। প্রতিমা তোয়ালাটা আগাইয়া দিয়া গেলাস টিপয়ের উপর রাখিল।

'আজ কি পড়ে শোনাবে, প্রতিমা ?'

'প্রথমেই', প্রতিমা কাছে আসিয়া গদি-আঁটা মোড়াটার উপর বসিয়া খাম হইতে একটা টেলিগ্রাম খুলিতে খুলিতে কহিল, 'দাদার টেলিগ্রাম পড়ে শোনাই। কাল বিকালে এসে পৌঁচচ্ছেন...'

'মহিম! কাল! পড়, পড় শুনি।' সঞ্জীব হৃষ্টকণ্ঠে কহিল।

প্রতিমা মহিমের টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া শুনাইল। মহিম কাল দুপুরে দম্‌দম বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছাইয়া বিকেলের দিকেই দশার্ণপুরে হাজির হইবে বলিয়া আশা করে।

চিঠিপড়া সমাপ্ত করিয়া প্রতিমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' তার কোলে ; অলসভাবে পাতাগুলি সে দু'চারবার উল্টাইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎই পড়িবার চেষ্টা করিল না।

'দাদা এসে নিশ্চয়ই আমাকে খুব বকবেন।'

'বকবে! বকবে কেন ?'

'আমি ঠিকমত কারখানা চালাতে পারিনি। আমি অনর্থ বাধিয়েচি।' প্রতিমা অপরাধীর মত কহিল।

'কারখানা চালাবার ভার তো তোমার উপর ছিল না, প্রতিমা।' সঞ্জীব কহিল। 'যদি বিগ্‌ড়েই থাকে, তুমি দায়ি হবে কেন ?'

'সব দায়িত্ব আমার ওপরই ছিল, কে বলে ছিল না।' প্রতিমা কহিল। 'কিন্তু দায়িত্ব আমি উচিতমতো পালন করতে পারিনি। শুধু তাই নয়, এমন একটা ব্যাপার ঘটতে দিয়েছি, যার চেয়ে বেশি লজ্জার ব্যাপার দাদার পক্ষে আর কিছু হ'তে পারত না।' বলিয়া প্রায় অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিতে সে একবার সঞ্জীবের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার দিকে সভয়ে তাকাইল।

'তুমি কি আমার জখম হওয়ার কথা বলছ ?' সঞ্জীব বিব্রত হইয়া প্রশ্ন করিল। 'পাগল! এতে তোমার দোষ কোথায়। এর দায়িত্ব

সম্পূর্ণ আমার নিজের। কিন্তু এই আঘাত উপলক্ষ্য করে' যা পেয়েছি, তা স্বপ্নাতীত। এ নিয়ে তুমি সামান্যতম সঙ্কোচও রেখোনা। আমি তো বরঞ্চ একে দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে করচি; প্রায়শ্চিত্তের এতো বড়ো একটা সুযোগ না পেলে আমি যে শান্তিই পেতাম না! হাওড়ার মিলে একবার গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলাম, সেই ঘটনাটা কি তোমার মনে আছে? সেই হুকুমে পাঁচ পাঁচটা লোক জীবন হারিয়েছিল। অনেকগুলি লোক জখম হয়েছিল। সেই আর্ত্তনাদ, সেই বিলাপ দুঃস্বপ্নের মতো আমাকে অনুসরণ করে এসেছে। তোমাদের কারখানার সামনে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার কিছুটা সুযোগ পেয়ে অনেকটা যেন হাল্কা বোধ করছি। যারা মারে, আমি শুধু তাদের দলের নই; যারা মরে আমি তাদেরও দলের, এই কথাটা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল।…কিন্তু এসব থাক, এবার তুমি পড়ো। 'ছিন্নপত্রে' যেন বাংলার নদী, বাংলার আকাশ, বাংলার ধানক্ষেত, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকেই আস্বাদন করা যায়। তোমার হাতে নতুন জীবন লাভ করবার পর পৃথিবীকে দেখবার ক্ষুধা আমার কি রকম যে বেড়ে গেচে…'

প্রতিমা তবু বই খুলিল না। ক্ষণকাল দ্বিধা করিয়া সে কহিল, 'তুমি একদিন কারখানার কুফল সম্বন্ধে যা বলেছিলে, তাকে আমরা ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ এমন কোনও বড়ো সমস্যা নয়। কিন্তু আজ বুঝেচি, তোমার ভবিষ্যৎবাণী কতখানি সত্য। সংঘাত, সংঘর্ষ, মালিন্য কারখানার অপরিহার্য্য সঙ্গী। অনেক হিংসা, অনেক নোংরামি এরা টেনে আনে। কি দরকার ছিল গাঁয়ের মধ্যে একে ডেকে আনার। তাই, কারখানাতে যখন আগুন লাগল, আমার মনে হলো, এই ঠিক, এই ঠিক হয়েচে…'

'না, প্রতিমা, এ ঠিক হয় নি।' সঞ্জীব গম্ভীর ভাবে কহিল। 'কারখানার যে খুব বেশি ক্ষতি হয় নি, এতে আমি আনন্দিত। মনে

করো না, তোমাদের প্রতি ভালবাসা বশতই এমন কথা আমি বলচি। অনেক বিবেচনা করেই বলচি। কিছু দিন আগে আমি একটা বই পড়ছিলাম। তার একটা কথা আমার মনে বড় লেগেচে। যন্ত্র বা কল দানব নয়। মানুষের পরিশ্রম লাঘব এবং প্রকৃতির সম্পদ মানুষের শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পূর্ণতর ভাবে নিয়োগ করবার উদ্দেশ্যেই যন্ত্রের সৃষ্টি; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বৈজ্ঞানিকদের এ দানের তুলনা নেই। কিন্তু লোভী মানুষ তা সর্ব্বজনেব কল্যাণে নিয়োগ না করে' ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবৃদ্ধির কাজে লাগিয়েচে। ক'জনের অতি-লোভের আকাঙ্খা বহুর স্বার্থের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েচে। দানব কল-কারখানা নয়, দানব মানুষের স্বার্থপরতা। কারখানাগুলিকে যদি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে চালানো যায়, তবে আপত্তির আর কোন কারণই থাকে না।···কথাটা এমন কিছু নতুন নয়, তবু বড়ো চমক লাগল। তারপর যতই ভাবচি, কারখানার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ বদ্‌লে গেছে···'

'তা বদলাক্ আর নাই বদলাক্,' প্রতিমা আশঙ্কিত ভাবে কহিল, 'একদিনে এত বেশি কথা বলা চলবে না···'

'তবে চল, একটু জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। একবার বাইরেব পৃথিবীটা দেখি। কারখানার কতটা ক্ষতি হয়েচে দেখি···'

'আজ থাক। আজ আর নয়। কাল প্রথমেই জানলার কাছে নিয়ে দাঁড় করিযে দেব, যতক্ষণ ইচ্ছে দেখো।'

'তবে একটু পড়ে শোনাও।' প্রতিমার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কহিল।

প্রতিমার মুখে 'তুমি' সম্বোধনটা সঞ্জীবের কাছে একটা মাদকতার মতো লাগে। কত নিবিড় সাহচর্য্যে, কত একান্ত নির্ভরতার ফলে, কত শুশ্রূষা ও সেবার অধিকারে প্রতিমার মুখে এই 'তুমি' সম্বোধনের জন্ম হইয়াছে।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই মহিমের মোটর দশার্ণপুর জমিদারবাড়ির সিং-দরজা দিয়া ঝড়ের বেগে ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। ছ'হাজার মাইলের দূরত্ব যে তিন দিনে অতিক্রম করিয়াছে তার উপযুক্ত গতি বটে!

সিঁড়ির ধার ঘেঁষিয়া খোলা চত্বরে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিল, মহিম সিঁড়ি দিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে কাছে হাজির হইল। প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, 'সঞ্জীব কেমন আছে?'

'ভালো আছেন।' প্রতিমা দাদার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

'প্রতিমা, আমি প্রায় ভাবতেই পারিনে আমাদের হাতে তার এমন নিগ্রহ হ'তে পারে।' মহিম সসঙ্কোচে কহিল। 'এত বিবাদ করে', এত স্পর্দ্ধা করে' কারখানা খুললাম কি তাকে খুন করবার জন্য! আর একটু হলে কি সর্ব্বনাশই হ'তো! শুনলাম-খুব নাকি তুই সেবা করেচিস। লজ্জার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচিস। কী হাঙ্গামা বল তো! লোক মেরে কারখানা চালাতে হবে! তার চেয়ে বরঞ্চ কারখানা তুলে দেব...'

'চল, ভেতরে চলো দাদা।' প্রতিমা শান্ত কণ্ঠে কহিল। 'মা পূজোর ঘরে আছেন।'

'তার আগে সঞ্জীবকে একবার দেখে যাই চল।' মহিম হাঁটিতে হাঁটিতে কহিল। 'ভাগ্যিস তুই এতো করেচিস, নইলে তার কাছে আর মুখ দেখানো যেতো না...'

কড়াইডর্ দিয়া সামান্য অগ্রসর হইয়া মহিম সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। সামান্য একটু দ্বিধা করিল, তারপর একটু সঙ্কুচিত ভাবেই কহিল, 'এটা খুবই একটা শোচনীয় ব্যাপার হয়ে গেল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে কেশবের ওপর যেন আমরা অবিচার না করি। সেটা অনুচিত হবে। স্ট্রাইক্ এবং স্ট্রাইকের দরুণ যা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেচে, তা হয়তো কেশবের অতি-উৎসাহ আর কাজ-পাগ্‌লামির ফল। কিন্তু ওর মনে যে

কোনও খারাপ অভিসন্ধি বা মজুরদের অযথা জব্দ করার বা ঠকাবার ইচ্ছে ছিল না, তা আমি জোর করেই বলতে পারি। ওকে তো জানিস্, কাজ বলতে কেমন ক্ষেপে ওঠে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সেই কাজ বন্ধ হ'তে দেখে ওর বিচার-বোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত দোষ ওর নয়। যে ব্যবস্থায় শ্রমিকে মালিকে এত সহজে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, দোষ সেই ব্যবস্থার। কেশবের দোষ এই যে, সে প্রাণপণে আমাদের উপকার করতে···হ্যারে, এ কি শুনলাম? কেশব দম্‌দমে হাজির ছিল, বল্লে তুই নাকি চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙে দিইচিস?···'

'হ্যাঁ, দিয়েচি।' প্রতিমা স্পষ্ট গলায় কহিল।

'এটা কি তার ওপর অবিচার হলো না?'

'তা জানিনে, দাদা।' প্রতিমা মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল। 'কিন্তু এ না করলে আমার নিজের ওপর অবিচার করা হ'তো। ভুল টের পেয়ে শোধ্‌রাবার সময় পাওয়া গেছে, এইটে কম সৌভাগ্যের কথা নয়···'

মহিম একবার বিস্মিত ভাবে ভগ্নীর আনত মুখের দিকে চাহিল। কহিল, 'চল।'

আগের দিনের সেই ঈজিচেয়ারে আগের দিনের মতোই জানালার ফ্রেমে আঁটা মেঘ-সজল আকাশের দিকে চাহিয়া সঞ্জীব চুপ করিয়া বসিয়াছিল, দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া পিছনে তাকাইল। সানন্দকণ্ঠে কহিল, 'আরে, মহিম! এসে পড়েচিস!' বলিয়া নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিল।

'উঠিস্‌নে। বস্!' বলিয়া মহিম তাড়াতাড়ি কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'সঞ্জীব, তোর কাছে আমরা হেরে গেছি। তোর কথাই ফলে গেছে, কারখানার কুফল আমরা ঠেকাতে পারলুম না।

আসতে আসতে পোড়া কারখানাটার দিকে চেয়ে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিজম্ যে হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা-স্বার্থপরতা জাগিয়ে তোলে, সেই আগুনেই আমাদের কারখানা পুড়েচে। ক্ষতি এমন কিছু হয়নি, সহজেই কারখানা আবার চালু করতে পারি, কিন্তু ভাবছি, দানবকে আবার জীইয়ে তোলার কি কিছু প্রয়োজন আছে ?...'

'জীইয়ে তুলতেই হবে, মহিম', সঞ্জীব বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিল। 'আমার সে গোঁড়ামি আর নেই। আমি বুঝেচি, যন্ত্রের কর্ম্মকুশলতা কতখানি। মানুষের কাছে এই উৎপাদন-ক্ষমতার আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি, তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তা জেনেছি। কলকে তাচ্ছিল্য করা চলবে না। কলের নোংরামি আটকাতে হবে অন্য উপায়ে। মালিকের স্বার্থবুদ্ধির জন্য কারখানা চালানো চলবে না। কারখানাকে হতে হবে জাতীয় সম্পত্তি। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণে কারখানা চললে তবেই তা...'

'কিন্তু আমি দিতে চাইলেই স্টেট্ নিচ্চে কোথায় ?' মহিম প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'এ হাঙ্গামা চুকিয়ে দিতে পারলে তো বাঁচতুম...'

'যতদিন স্টেট্ না নিচ্চে,' সঞ্জীব কহিল, 'ততদিন আমাদেরই চালাতে হবে। কিন্তু নিজের সম্পত্তি হিসেবে নয়। কারখানার কাজে যারাই খাটবে, কারখানা তাদের যৌথ-সম্পত্তি। এই মন্ত্র নিয়ে যদি কাজ শুরু হয়...'

'দেখুন, দয়া করে' একটু থামবেন।' সহসা প্রতিমা গম্ভীরকণ্ঠে কহিল।

'অনেকদিন পরে মহিম এসেচে', সঞ্জীব প্রতিমার দিকে সহাস্যে চাহিয়া কহিল, 'আজ একটু বলতে দাও।'

'না। সেটি চলবে না।' প্রতিমা রাজি না হইয়া কহিল। 'দু'বন্ধুতে দেখা হলেই কি তর্ক না বাঁধিয়ে আপনারা থাকতে পারেন না ?

মাথার ঘা এখনও শুকোয় নি, সে খেয়াল আছে ? কারখানার ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাবলেই চলবে। যাও, দাদা, মার সঙ্গে দেখা করো গিয়ে…'

'তথাস্তু।' মহিম সকৌতুকে কহিল। 'নার্সের কথা অমান্য করা চলে না, কি বলিস, সঞ্জীব ?' বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কহিল, 'জামা-কাপড় বদ্‌লেই আবার আসচি। অনেক গল্প আছে।'

মহিম প্রস্থান করিবার পর প্রতিমা টাইম্‌-পীসে সময় দেখিয়া ওষুধের টেবিলের কাছে গেল। শিশি হইতে মেজার গ্লাসে এক গ্লাস ওষুধ ঢালিয়া সঞ্জীবের কাছে আসিয়া সে নার্স-সুলভ মামুলি গলায় কহিল, 'খেয়ে নাও।'

'আর ওষুধ কেন, প্রতিমা।' সঞ্জীব ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কহিল। 'রৌদ্র আর বাতাসেই এবার শরীর সেরে উঠবে…'

'রৌদ্র আর বাতাস নিয়ে আবার এক নতুন থিয়োরি পরখ করা হবে নাকি ?' প্রতিমা গম্ভীর ভাবে কহিল।

'না, থিয়োরি আর নয়,' সঞ্জীব সহাস্যেই কহিল। 'কিন্তু একটু হাঁটা প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে পারি কি ? একটু জানালার কাছে নিয়ে যাওনা, পৃথিবীকে একবার চেয়ে দেখি…'

প্রতিমার কাঁধে ভর দিয়া সঞ্জীব বড়ো জানালাটার কাছে গেল। বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, হরিৎ পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য সে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। জমিদারবাড়ির বাগান-খাল-ঝোপঝাড় ছাড়াইয়া, নবাঙ্কুর ধানের বিস্তৃত ক্ষেত পার হইয়া, গ্রামোন্নয়ন-সঙ্ঘের পরিত্যক্ত কুটিরগুলি অতিক্রম করিয়া দিক্‌চক্ররেখার গায়ে কারখানার আংশিক-দগ্ধ শেড্‌গুলিতে যাইয়া দৃষ্টি বাধা পাইল।

'সব কারখানার চেহারাতেই কেমন একটা রাক্ষুসে ভাব আছে।' সঞ্জীব সুদূরে চাহিয়াই প্রতিমার উদ্দেশে কহিল। 'এই চেহারাটাই প্রথম মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। পৃথিবী এবং প্রকৃতির সঙ্গে এর যেন মিল নেই। আমার তো মনে হয়, গাছপালা দিয়ে, পুকুর-বাগানের বৈচিত্র্য এনে, ফ্যাক্টরি-বাড়ির স্থাপত্য-ভঙ্গির পরিবর্ত্তন করে' প্রথমেই এর চেহারা একটু ভদ্রগোছের করে' নেওয়া দরকার। যন্ত্রকে দানব বানালে চলবে না, যন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে হবে। আজ তো আমার মতো সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই প্রতিমা; তুমি আমাকে কত বড় অমূল্য সম্পদ দান করেচ। তাই আজ এমন অকৃত্রিমতার সঙ্গে সমস্ত জগতের হিত-কামনা করতে পারচি। মনে হচ্চে, কিছু করা দরকার, যাতে শুধু তুমি আর আমি নয়, দু'হাজার দুলক্ষ নয়, পৃথিবীর সমস্ত লোক সুখী হ'তে পারে, অভাবের উর্দ্ধে উঠতে পারে, অশান্তি থেকে অব্যাহতি পায়, সত্য, ন্যায় ও সাম্যের…'

'কিন্তু তারও আগে সমস্ত অসুস্থ লোকদের কথা বন্ধ করা চাই।' বলিয়া প্রতিমা তার আঙুলের ডগা দিয়া আল্‌তো ভাবে সঞ্জীবের মুখ চাপা দিল। 'ঐ দেখো, চিম্‌নিটা কেমন কাৎ হয়ে পড়েছে! এটা ওর বশ্যতা-স্বীকারের প্রতীক। ওর উঁচু মাথাটা একেবারে নিচু হয়ে গেছে।'

সঞ্জীব কারখানার বড়ো চিম্‌নিটার দিকে চাহিল। কালো সিপাহীর মতো সটান লোহার প্রকাণ্ড উঁচু চিম্‌নি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন সারা গ্রামটাকে সেলাম করিতেছে। সূর্য্যাস্তের রাগবিন্যাস তার রুক্ষতার মধ্যেও যেন একটা সৌজন্যের আভাস আনিয়া দিয়াছে।

'হ্যাঁ, নত হয়েছে সারা গ্রামের কাছে।' সঞ্জীব বেশ খুসির সঙ্গে কহিল। 'এ বেশ বুঝতে পেরেছে, গ্রামবাসীদের সুখ-সুবিধার সম্মান করেই কারখানাকে চলতে হবে; তারাই তার প্রকৃত প্রভু!' বলিয়া সে প্রতিমার দিকে সহাস্যমুখে চাহিল।